Fulkumari by Sihab Sorkar

For More Books Visit www.MurchOna.com

suman_ahm@yahoo.com

ফুলকুমারী

শিহাব সরকার

সপ্তাহে চারটা টিউশানি করে তারেক। দুটো মেয়ে, দুটো ছেলে। চারজনকে পালাক্রমে পড়াতে হয়, সুবিধার জন্যও ছক কেটে নিয়েছে। চার ছাত্র শহরের তিন এলাকায় থাকে। একজনের বাসা কামরাঙ্গির চরের কাছে নবাবগঞ্জ এলাকায়। যেতে আসতে প্রাণ বেরিয়ে যায়। রিক্সায় ওঠার ক্ষমতা নেই তারেকের। সব জায়গায় বাসে যাতায়াত। খুব একটা অসুবিধা হয় না। শহরের সুন্দর সুন্দর বাস নেমেছে। কিন্তু গুলিস্তান-নবাবগঞ্জ লাইনের বাসগুলো বোধ হয় ষাট দশক থেকে একই রকম আছে। শুধু এই বাসগুলোতে চড়ার কষ্টের জন্য নবাবগঞ্জের টিউশনিটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়। সাহসে কুলায় না। তারেক সবচেয়ে বেশি টাকা পায় এ

জায়গায়। ছাত্রটা গবেট, ওর বাবা চকবাজারের নামকরা ব্যবসায়ী। ছেলে দু'বার এসএসসি ফেল করেছে। ভদ্রলোক তারেকের হাত ধরে প্রায় মিনতি করে বলেছে, ও যেন কোনো রকমে ছেলেকে ম্যাট্রিকটা পাস করিয়ে দেয়। তারপর ছেলের আর পড়াশোনার দরকার নেই। ব্যবসায় নামবে। তাছাড়া যেদিন ও আসে এ বাসায়, ওর রাতের খাবারের খরচ বেঁচে যায়। রাতের খাবারটা সারতে হয় এখানে।

ওর বাকি এক ছাত্র ও দুই ছাত্রীর মধ্যে ওকে এখন জ্বালাচ্ছে তিন্নি নামের মেয়েটা। সেও এসএসসি দেবে। পরীক্ষার আর দু'মাস বাকি। কিন্তু তা নিয়ে ওর বিন্দুমাত্র ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে বিউটি পার্লারে যাওয়া শুরু করেছে, প্যান্ট-শার্ট পরে, বয়ফ্রেন্ড আছে গোটা তিনেক। উড়নচন্ডি মেয়ে, কোনো হোমটাস্ক করে রাখে না- যতটুকু লেখাপড়া, তা তারেকের সামনেই হয়। তখন তিন্নির বড় খালা কোনো না কোনো ছুতায় তিন্নির ঘরে আসেন কয়েকবার। তিন্নির মা দিনরাত বিছানায় শুয়ে থেকে যন্ত্রণায় এপাশ-ওপাশ করেন। তাঁর ক্যান্সার। সংসার দেখেন আপন বড়বোন। বোনটি বিধবা। পরম মমতায় সংসারটি আগলে রেখেছেন। তারেক বোঝে ব্যাপারটা। মহিলা ভাগ্নিকে গার্ড দেন। ভেতরে-ভেতরে ও হো হো করে হাসে। যে-মেয়ে স্কুলে যাবার নাম করে ছেলেবন্ধুদের নিয়ে শহরের বাইরে ফুর্তি করে আসে, তাকে হতদরিদ্র মাস্টার ফুসলে নেবে? এটা ঠিক, তারেক দেখতে সুদর্শন, কিন্তু ওর গায়ে রং-চটা, ছাতা-পড়া একই শার্ট দিনের পর দিন, প্যান্টের হিপের কাছটা পাতলা হয়ে গেছে, পাছা প্রায় দেখা যায়, শার্ট ইন করে পরতে পারে না, স্ট্র্যাপ ছাড়া স্যান্ডেলের এক পাটির গোড়ালি ক্ষয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। এই হতশ্রী পোশাকের মাস্টারের প্রেমে পড়বে

তিন্নি? তার ওপর শুরুতেই একদিন ফট করেও বলে ফেলেছে, ‘স্যার আপনি গোসল করেন না? আপনার গা থেকে গন্ধ আসে।’ তারেক বুঝতে পারছিলো, লজ্জায় এবং অপমানে ওর ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেছে।

আজ তারেকের দেরি হলো তিন্নির জন্য। ওর বার্থডে ছিলো। আধঘন্টার জন্য বই নাড়াচাড়া করে পড়ার পাট শেষ করতে হলো। তারপর ছাদে ত্রিপলের নীচে এক কোনায় বসে তিন্নি এবং তার বন্ধু-বান্ধবীদের হুল্লোড় দেখা। চড়া মিউজিক বাজছে। খারাপ লাগছিলো না। তিন্নির মেজোখালাকে তারেকের বেশ মনে ধরেছে। আগুনের চঞ্চল শিখার মতো তরুণী। নাচতে নাচতে তাকাচ্ছিলো তারেকের দিকে। চোখে চোখ পড়া মাত্র তারেক চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলো। তারপর ভিড়ের মধ্যে ব্যাকুল দৃষ্টি আবার খুঁজে বের করে নিচ্ছিলো বুনো লীলা-লাস্যে উচ্ছল তরুণীকে। আবার চোখে চোখ। আবার চোখ ফিরিয়ে নেয়া। মোহগ্রস্তের মতো তারেক বসে ছিলো। একবার তিন্নি এসে হাত ধরে কানের কাছে মুখ এনে বলেছিলো, ‘স্যার আসুন না! সিনিয়াররাও তো ডান্স করছে।’ তারেক বলেছিলো, ‘ডোন্ট ওরি। আই য়্যাম ফাইন হিয়ার।’ তিন্নি শ্রাগ করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলো। ডান্স শেষ হতে হতে রাত দশটা। তারপর খাওয়া। আজ তারেক খেতে চায়নি। ওর চিন্তা নৌকাটা না চলে যায়। তাহলে ও ঘরে পৌঁছুতে পারবে না। তারেক উঠে আসতে চাইছিলো, কিন্তু তিন্নি কিছুতে না খেয়ে আসতে দিলো না।

ঘাট পুরো অন্ধকার নয়, আকাশে মেঘের ফাঁকে ক্ষয়ে-যাওয়া চাঁদ ভেসে উঠছে। খানিক দূরে পুলিশ ক্যাম্পে আলো জ্বলছে। ভেজা বাতাস বইছে। মনে হয়, এখনি বৃষ্টি নামবে। আশপাশে আশ্রয় নেয়ার মতো জায়গা নেই। চারদিক সুনসান। সামনে বিশাল মাঠ, বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার ফলে এখন যেন অথৈ সাগর। চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো দালান, টিনের ঘর। সব আধডোবা। ওসব বাড়িতে যাওয়া আসার মাধ্যম ছোট ছোট নৌকা। শুকনো মৌসুমে রিক্সা চলে। ফজর আলী নৌকা নিয়ে চলে গেছে। নিশ্চয় অপেক্ষা করেছে অনেকক্ষণ। ওর নৌকায় সাধারণত তারেকই শেষ যাত্রী, কালে-ভদ্রে দু'একজন থাকে। আজ ও বেশ দেরি করে ফেলেছে। এখন কী উপায় হবে, ওর মাথায় ঢুকছে না। যে কোনো সময় বৃষ্টি নেমে যেতে পারে। এনামুলের বাসায় যাওয়া যায়। কিন্তু সে অনেকটা পথ। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত হেঁটে যেতে পাঁচ-সাত মিনিট লেগে যাবে। তারপর মোহাম্মদপুরের বাস এত রাত পর্যন্ত আছে কিনা, তাও নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় তারেকের চোখে পড়লো নৌকাটা। আরে, এতক্ষণ ওটা চোখে পড়লো না কেন? ঝোপের কিনার দিয়ে নৌকার অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। হয়তো ফজর আলী ঘুমিয়ে আছে পাটাতনের ওপর। দ্রুত এগিয়ে গেলো তারেক নৌকাটার কাছে। নৌকায় মানুষ নেই। দড়ি দিয়ে খুঁটি বা গাছের সঙ্গে ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে। এটা সম্পূর্ণ ছাড়া অবস্থায় পানিতে অল্প-অল্প দুলছে। নৌকাটাও ফজর আলীর নৌকা নয়। এটা ছোট ধরনের লম্বাটে ডিঙি।

নৌকা যারই হোক, কোনো চিন্তা-ভাবনা না করে তারেক নৌকায় উঠে বসলো। ম্যাচ জ্বালিয়ে দেখে বৈঠা বা লগি এসব কিছুই নেই। সামান্য পথ। ঐ যে, ওর ঘর আবছা দেখা যায়। এটুকু পথ দু'হাতে বেয়ে যাওয়া যাবে। তারেক থিকথিকে কাদায় নেমে একটা ধাক্কা দিয়ে নৌকায় উঠে বসলো। নৌকা এগিয়ে গেলো বেশ কিছুদূর। এবার মিনিট দশেক হাত দুটো দিয়ে বৈঠার কাজ চালালেই চলবে। তারেক বোধ হয় ধাক্কাটা জোরেই দিয়েছিলো। নৌকা বেশ তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এখনো ও হাত লাগাচ্ছে না। ঘষা-জ্যোৎস্নায় আশপাশের বাড়িঘর দেখা যায়। তারেকের বাড়িঅলা পিডিবিতে এ্যাকাউনটেন্টের চাকরি করতেন। রিটায়ার করে ঢাকার এই শেষ প্রান্তে তিনটা টিনের ঘর তুলেছেন। বিদ্যুৎ, গ্যাস, সুয়েরেজ ইত্যাদির লাইন এখনো আসেনি এদিকে। ফলে হাউজ বিল্ডিং-এর লোন পাওয়া যাচ্ছে না। লোন পেলে বাড়ি তুলে ফেলবেন। তাঁর ছ'কাঠা জায়গা। অনায়াসে দুই ইউনিটের পাঁচতলা বাড়ি তুলতে পারবেন। মকবুল সাহেবের তিনটা ঘরের মধ্যে তারেকের ঘরটা সবচেয়ে ছোট। একটা ঘরের কাজ শেষ হয়নি। বড় ঘরটায় চার ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি থাকেন। তারেক যে বছর তার ঘর ভাড়া নেয়, সে বছরের শুরুর দিকে হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর স্ট্রোক করে। তিনদিন অজ্ঞান থাকার পর ভদ্রমহিলা মারা যান। তাঁর বড় ছেলে এ মাসের শুরুর দিকে একটা প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারির চাকরি পেয়েছে। পরেরটা ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র। বাকি দু'জন পিঠেপিঠি দুই বোন। ক্লাস নাইনে এবং সেভেনে পড়ে। ছেলের বেতনের টাকা এবং তাঁর পেনশনের টাকা মিলিয়ে মকবুল সাহেবের সংসার চলে।

মোটেই সচ্ছল নয়, বলা যায় টানাটানির সংসার। বড় ঘরটার পাশে মকবুল সাহেব এবার বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে সবজির বাগান করেছিলেন। ভালো ফলন হয়েছিলো। নিজেরা খেয়ে বিক্রি করলে ভালো লাভ থাকতো। কিন্তু বন্যার পানিতে সব গেছে। আর কিছুদিন পরই তিনি ঝিঙ্গা, বেগুন, ঢেঁড়শ ঘরে তুলতে পারতেন। দূরে বুড়ীগঙ্গার শাখাটা এভাবে রাতারাতি কূল ছাপিয়ে যাবে, মকবুল সাহেব কল্পনাও করেননি। তিন-চারদিনের মধ্যে পুরো এলাকায় বন্যার হাঁটুপানি, তারপর কোমর ছুঁইছুঁই। প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে এদিকের নীচু জমিগুলো বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। মকবুল সাহেবের ঘর তিনটা বেশ উঁচুতে। কিন্তু এবার বন্যা তাঁকেও ছাড়েনি। ভীষণ মুষড়ে পড়েছেন তিনি। পুরো সংসার, রান্নাবান্না উঠে এসেছে চৌকির ওপর। আজকালের মধ্যে একটা কোসা না কিনলেই নয়। ছেলে-মেয়েদের শহরে যেতে হয়, তাঁরও টুকটাক কাজ থাকে বাইরে। কাজের বুয়াটা ভালো। রিক্সাঅলা স্বামী এবং একটা বাচ্চাসহ ওকে মকবুল থাকতে দিয়েছেন অসম্পূর্ণ ঘরটায়। ও মাচা থেকে নেমে কোমর পানি পেরিয়ে এসে রোজ রান্না করে দিয়ে যায়, হাফিজ সাহেবের বাসা থেকে কলসী করে খাবার পানি আনে। তাঁর টিউবওয়েলটা ডোবেনি।

মকবুল সাহেব কয়েকদিন ধরে তারেককে দেখলেই বিব্রত হয়ে পড়ছেন। তারেক ওর ব্যবহার আগের মতোই স্বাভাবিক রেখেছে। সে বোঝে, ভাড়া দেয়ার সময় মকবুল সাহেব মিথ্যা বলেননি। এদিকে বন্যার পানি আসে না। ফজর আলী মাঝি বলেছে, আটাশির বড় বন্যার পর এই প্রথম এদিকে বাড়িঘর ডুবেছে। উল্টো তারেক আগ বাড়িয়ে মকবুল সাহেবের খোঁজ-খবর নেয়, নিজ থেকে জানায় ওর তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। ওর ভয় শুধু সাপে। মকবুল সাহেব জানিয়েছেন, এখনো সাপ তাঁর চোখে পড়েনি। ভদ্রলোকের জন্য তারেকের মায়া হয়। কথা বলেন কম, ভীরু প্রকৃতির, চাঁদাবাজ আর মাস্তানদের ভয়ে সব সময় তটস্থ। ঘরে দু'দুটো মা-মরা কিশোরী মেয়ে, দেখতে সুন্দরী। একজন নাইনে পড়ে, একজন সেভেনে। তারেক মকবুল সাহেবের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারে।

মাত্র দুটো হাত চালিয়ে এমন চমৎকার নৌকা বাওয়া যায়, তারেকের ধারণা ছিলো না। তরতর করে এগিয়ে চলেছে ডিঙিটা। মৃদু হাওয়া বইছে, পানিতে ছোট ছোট ঢেউ। খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে তারেকের। কিন্তু খাবে কিভাবে? দুটো হাতই যে বৈঠা। নৌকাটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়ে সিগারেট খেয়ে নিলে হয়। নৌকাটা কার সে জানে না। এখন সেই ওটার মালিক। ঘরে ফিরে পানিতে ঠেলে দেবে। তখন যেদিকে খুশি ভেসে যাক। সারাদিন ঘরের পাশ দিয়ে যাত্রীভর্তি নৌকা যায়, ফজর আলীর কোসা তো আছেই।

নৌকাটা পানিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ভাসছে। কোনো দিক-নিশানা নেই। সিগারেট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দেয় তারেক। ফেরার সময় তিন্নির মেজোখালা ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলো, 'এখনি যাবেন? ডিনারের পর আবার ডান্স হবে।' তারেকের প্রতিটি রোমকূপে যৌবনের দাহ জ্বলে উঠেছিলো। এবার তরুণী ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, মাত্র হাত দুয়েক দূরে। তেমন মেকআপ নেয়নি, জিনসের ওপর ঢোলা শার্টের ভিতর থেকে ওর শরীরের বন্যতা ফেটে বেরিয়ে আসছিলো। কী পারফিউম মেখেছে কে জানে? কড়া নয়। সেই সঙ্গে নিশ্চয় তরুণীর ঘামের গন্ধ। অজানা এক আবেশের ঢেউ তারেককে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। কোথায়, ও জানে না। তারেক মেয়েটির মুখ থেকে চোখ না সরিয়ে মোলায়েমভাবে বলেছিলো, 'আরেক দিন। অনেক দূর থাকি। ট্রান্সপোর্ট পাওয়া যাবে না।' তরুণী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলো, 'আমার গাড়ি আছে। আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো যত রাতই হোক। কোথায় আপনার বাসা?'

তারেক হাতজোড় করেছিলো, 'না, আজ আমাকে এখনি যেতে হবে। আরেকদিন অনেকক্ষণ থাকবো।' ও কোথায় থাকে, বন্যার পানি, নৌকা পাওয়া-না পাওয়া ইত্যাদি পর্যন্ত যাতে কথা গড়িয়ে না যায়, তারেক সেজন্য দ্রুত বিদায় নিয়ে চলে এসেছিলো। তার আগে শেকহ্যান্ডের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো তরুণী। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করে তারেক ওর হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলো তরুণীর কোমল, উষ্ণ হাত। জীবনে সেই প্রথম একজন পূর্ণাঙ্গ নারীর স্পর্শ, বুকের ভিতর কোথায় যেন ছলাৎ করে উঠেছিলো তারেকের। পুরো শরীরে শিহরণ জেগেছিলো।

তারেকের হাতে এখনো তরুণীর হাতের ঘ্রাণ লেগে আছে। আর আছে এক রূপসী নারীর স্পর্শের উত্তাপ।

তারেক ওর ডান হাতটা গালে বুলায়, নাকের কাছে আনে। একটা মৃদু সৌরভ আসছে। ওর হাত থেকে নয়। এ গন্ধটা অন্য রকম। তরুণীর গায়ের ঘ্রাণের সঙ্গে মিলছে না। তবে এও এক অনির্বাচনীয় সৌরভ। আশপাশে বোধ হয় বন্যার পানিতে পদ্ম বা কোনো জলজ ফুল ফুটেছে। বন্যার পানিতে লতাগুল্ম হয়? তারেক জানে না। ও ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে নৌকার আশেপাশে দেখলো, পানি ছাড়া কিছু চোখে পড়লো না। তবে গন্ধটা ওর চারপাশে ম' ম' করছে। যেন ঘিরে আছে ওকে। সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠে গান হচ্ছে কোথাও। খুব সম্ভব কোনো বাসায় রেডিও বাজছে। কী গান, বোঝার চেষ্টা করলো তারেক। বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু গানের সুরটা ভালো লাগছে, যদিও কথা বোঝা যায় না। ভাসতে ভাসতে নৌকাটা এদিক-ওদিক যাচ্ছে। এক পর্যায়ে তারেক পাটাতনে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ও যেন নিজের বশে নেই।

ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে ম্যাচ জ্বেলে তারেক তালা খুললো। দেখে নিলো খাটের অবস্থানটা। তারপর নৌকা থেকে এক লাফে দরজার লাগোয়া খাটে উঠে নৌকাটা ঠেলে দিলো। ওটা এখানে রাখা ঠিক হবে না। কার নৌকা কে জানে! তবে নৌকাটা না হলে আজ ওকে ঘরে ফিরতে হতো না। কোনো ঐশী শক্তি যেন নৌকাটা ওর জন্য পাঠিয়েছে।

আসার সময় নৌকায় যে সুরভিটা ওর নাকে এসে লেগেছিলো, সেটা ও ঘরের ভেতরেও পাচ্ছে। এবারের বন্যার পানিতে অনেক ফুল ফুটেছে নাকি? হতে পারে। কাল ও ভালো করে খেয়াল করবে। তারেক হ্যারিকেনের আলোয় অবাক হয়ে খেয়াল করলো, ওর বিছানাটা আশ্চর্যরকম পরিপাটি। চাদরটা টানটান করে বিছানো, দুটো বালিশ পরপর ভাঁজ করে রাখা। এ রকম হবার কথা নয়। কিছুতেই নয়। সপ্তাহে একদিন ও বিছানা ঠিক করে। বাকি দিনগুলোতে বেডশিট দুমড়ে মুচড়ে থাকে, বালিশ দুটো মাঝখান দিয়ে ভাঁজ করা, ওয়াড় ময়লা, একটা আবার ফেঁসে যাচ্ছে। তুলো বের হয়-হয়। নাকে দুর্গন্ধ লাগে। কিন্তু আজ এ কী হলো? বিছানা তো পরিপাটি হয়েছেই, আর সবকিছু যেন সদ্য লন্ড্রি থেকে আনা। স্যান্ডেলজোড়া আলনায় ঝোলানো পলিথিনের বড় ব্যাগে রেখে ও বিছানায় আসন পেতে বসলো। গালে হাত। ঘরে হাঁটু পর্যন্ত পানি। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ও বিছানা থেকে নামে না।

ব্যাপারটা হলো কী? মকবুল সাহেবের দুই মেয়ে ঘরে বন্যার পানি ঢোকার পর থেকে আসে না। বড় মেয়েটা আসতো মাঝে মাঝে অঙ্ক বা ইংরেজি নিয়ে কোনো সমস্যায় পড়লে। কিন্তু ও কোনোদিন তারেকের ঘর বা বিছানা গুছিয়ে দিয়েছে বলে ওর মনে পড়লো না। গত তিন চারদিন তো ও দুই বোনের চেহারাই দেখেনি। হঠাৎ তারেকের চোখ পড়লো খাটের পায়ের কাছটায়। একগোছা সাদা ফুল। এটা কোত্থেকে এলো? হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ও ফুলের তোড়াটা হাতে নেয়। অচেনা সৌরভে ওর পুরো শরীর এক মধুর ঝাঁকুনি খেলো। ঘরটা যেন অল্প অল্প দুলছে। এরকম ফুল তারেক কখনো দেখেনি। আর, যে রিবনটা নিয়ে ফুলের ডাঁটিগুলো বাঁধা হয়েছে, সেটাও সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

তারেক রোমান্টিক। আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে ভালোবাসে। কিন্তু অলৌকিক কোনো ব্যাপারে ওর বিশ্বাস নেই। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ ধরে ওর ঘরে যে কাণ্ডগুলো হচ্ছে, সে সবের একটা অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা দিতো। ভূতপ্রেতের ব্যাপারটা এসে যেতো অনিবার্যভাবে। তারেক ফুলের তোড়াটা হাতে নিয়ে হতভম্বের মতো বসে থাকে। ওর ভেতরে কোথাও ভয়ের একটি সূক্ষ্ম ধারা কি বইতে শুরু করেছে? একদম না। ঘরের দুটো জানালাই বন্ধ। বিছানার কাছের জানালাটার ওপারে এক উচ্ছল, সুরেলা নারীকণ্ঠ, 'তারেক!'

তারেক চমকে উঠলো। 'কে? কে?' বলে ও বিছানায় উঠে দাঁড়ালো। জানালার কাছে গিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর প্রায় নিঃশব্দে খিল খুলে আচমকা পাল্লা দুটো ফাঁক করে ধরে। কেউ নেই। তবে একটা সৌরভ আছে। তারেক বুঝলো, এখন ওর ওপর ভর করে আছে তিন্নির মেজোখালা। এজন্য ওর মাথা আউলা হয়ে গেছে। ও স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

॥দুই ॥

একটানা চারদিন জ্বরে ভুগে বিছানা থেকে উঠলো এনামুল। তিন-চার মাস পরপর ওর এই জ্বরটা হয়। প্রচণ্ড

টেম্পারেচার ওঠে, জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে শুরু করে, কাজের বুয়াকে জ্বর নামাবার জন্য মাথায় পানি ঢালতে হয়। দীনা কেবল মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে যায়, ইচ্ছে হলে কপালে হাত রেখে বলে, 'ওষুধগুলো ঠিকমতো খাচ্ছো না। এই বিচ্ছিরি জ্বরটা তোমার আর হওয়ার কথা না। ডাক্তার সাহেব পরিষ্কার বলেছেন।' এনামুল তখন চোখ বন্ধ করে রাখে, ওর স্টকে যত খারাপ গালি আছে, সব মনে মনে উজাড় করে দেয় স্ত্রীর ওপর। দীনা চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ঘরটা ওর গায়ে-মাখা পারফিউমের গন্ধে ভুরভুর করে। সেটা অবশ্য এনামুলের মন্দ লাগে না।

মুখটা খুব তেতো হয়ে আছে। প্রতি দফা জ্বরের পর ওর এটা হয়। দু'দিন ভালো করে কিছু খেতে পারে না। আজ অফিসে একঘণ্টার জন্য হলেও হাজিরা দিতে হবে। বছরে পনেরো-বিশ দিন জ্বরের জন্য অফিস কামাই। অন্যান্য ছুটি তো আছেই। ওর চাকরিই থাকার কথা নয়। অফিসে টিকে আছে শুধু এমডি আফজাল হোসেনের কারণে। এই ভদ্রলোকের এক কলেজে পড় য়া মেয়ে এনামুলের মতো এরকম মাঝে মাঝে জ্বরে ভুগতো। এক পর্যায়ে মেয়েটার পড়াশোনা বন্ধ হবার মতো অবস্থা, কারণ দু-দু'বার জ্বরের জন্য এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারেনি। তখন এনামুল ওর গ্রামের নব্বুই পেরুনো এক দাদীর কাছ থেকে একটা কবিরাজি ওষুধ এনে এমডি সাহেবকে দেয়। দাদী বলেছিলেন, এটা জ্বরের ওষুধ। কাজ হবেই। এনামুলের তখন চাকরি যায় যায়। অফিসে ওকে রাখা হবে কি হবে না- এ নিয়ে দু'এক দিনের মধ্যে বোর্ড মিটিং বসছে। নিতান্ত হেলাফেলায় এনামুলের হাত থেকে ওষুধটা নিয়েছিলেন এমডি সাহেব। পরদিন অফিসে এসে তিনি এনামুলকে জড়িয়ে ধরেন, 'এনামুল! দি মেডিসিন হ্যাজ ওয়ার্কড লাইক ম্যাজিক। রীতিমতো ম্যাজিক। পুলিনার জ্বর কমে গেছে। ওর জ্বরতো কোনোবার চার-পাঁচদিনের কমে নামে না। কী ওষুধ দিলে ভাই!' পরদিন সাহেবের মেয়ে পুরো সুস্থ। সেই থেকে পুলিনা আর জ্বরে ভোগেনি। আর এনামুলের চাকরিও সে অফিসে চিরস্থায়ী হয়ে গেলো। কারণ, এমডিই অফিসের মালিক। তার ইচ্ছাতে অফিস চলে। তবে সব অফিসে কিছু খারাপ লোক থাকে, যারা বিনা কারণে কলিগদের ক্ষতি করে। এ অফিসেও সেরকম দু'একজন আছে। এরা আফজাল হোসেনের ছেলে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কান ভারি করে চলেছে এনামুল সম্পর্কে। ভবিষ্যতে এ ছেলেই অফিসের এমডি হবে। এনামুলের দুর্ভাগ্য। দাদীর কাছ থেকে এনে অজানা গাছের শেকড়-বাটা সে-ও খেয়েছিলো। কিন্তু সে ওষুধে ওর কাজ হয়নি। মাস কয়েক পরপর ওর ওপর জ্বরের আক্রমণ চলতেই থাকে।

এনামুল কেয়ার করে না। চাকরি না করলেও ওর চলবে। দীনা মডেলিংয়ে খুব নাম করেছে। এ্যাড ফার্মগুলোর মধ্যে ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি। ভালো কামাচ্ছে ও। সংসারের পুরো খরচ ওই দেয়। এনামুলের আর ক'টাকা বেতন। দীনা আগেও জানতে চায়নি, এখনো না। চাকরি ছাড়তে বাধ্য হলে ও অবশ্য তারেককে বলে দুটো টিউশানির ব্যবস্থা করে নেবে। হাত খরচের টাকা তো আর দীনার কাছে চাওয়া যাবে না। তবে সমস্যা একটা, চাকরি ছাড়লে বউয়ের সব বেলেল্লাপনা মুখ বুঁজে সয়ে যেতে হবে। এখন মাঝে-মধ্যে যে মৃদু প্রতিবাদটুকু করে, সেটা সম্ভব হবে না। কারণ, তখন ও হবে দীনার কেনা গোলামের মতো। এখনইবা এনামুল তার চেয়ে কম কী আর। চাকরি ওর এখনো যায়নি। বহাল তবিয়তেই অফিসে আছে। সুতরাং অযথা দুশ্চিন্তা কেন?

অফিস থেকে একঘণ্টা পর বেরিয়ে তারেককে ফোন করতে হবে। ও তখন ছাত্র পড়াবে হাতিরপুলের কাছে এক বাসায়। নম্বরটা আছে কিনা ইনডেক্সে দেখলো এনামুল। আছে। পুরো বাড়ি নিঝুম। দীনা খুব সকালে বেরিয়ে গেছে। মেঘনা ব্রিজের কাছে ওর শুটিং আজ, দুপুর পর্যন্ত কাজ চলবে। বুয়াকে প্রচুর লেবু দিয়ে একগ্লাস শরবত বানিয়ে আনতে বললো এনামুল। ড্রইংরুমের ফ্লোরে একটা ইংরেজি, একটা বাংলা দৈনিক পড়ে আছে। অনেক কষ্টে কাগজ দুটো উবু হয়ে এনামুল তুলে নিলো। দুটো কাগজেরই প্রথম পাতায় দীনা। হাসছে। নতুন এক টুথপেস্টের বিশাল সাইজের ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন। আজই বিজ্ঞাপনটা প্রথম বেরিয়েছে। দীনা হাসলে বেশ লাগে। কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে এনামুল। বুয়া শরবত নিয়ে ঢুকলো।

তারেক যে-বাসায় এখন ছাত্র পড়াচ্ছে, খুব সম্ভব সেখানকার ফোন খারাপ। এনামুল বাসে করে মতিঝিল থেকে শাহবাগ চলে এলো। ওখান থেকে হেঁটে হাতিরপুলের কাছে নর্থ রোড। এনামুলকে দেখে তারেক থ' হয়ে রইলো। এভাবে ও কোনোদিন ছাত্র পড়াবার সময় আসে না। তারেক তড়িঘড়ি করে আজকের মতো পড়ানো

শেষ করে এনামুলকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

- কী অদ্ভুত ব্যাপার। আমি আজ বিকালের দিকে তোর বাসায় যাবার প্ল্যান করেছিলাম। অফিস থেকে এলি? জ্বর পুরো ছেড়েছে? তারেক স্টার ফিল্টারের প্যাকেট বের করে বন্ধুকে অফার করলো। দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে প্যাকেট ঠেলে দিয়ে এনামুল বললো, 'সিগারেটের স্বাদ পাচ্ছি না। মুখ বিস্বাদ।' তারেক সিগারেট ধরালো। সোনারগাঁও রোডে উঠে এসে এনামুল বললো, 'কাগজে দেখলাম তোর ওদিকে বন্যার পানি উঠেছে। তোর ঘরও ডুবেছে নাকি?'

- আর বলিস না। পুরো এলাকা থৈ থৈ। নৌকা করে বাসায় যাওয়া-আসা করতে হয়। ঘরে হাঁটু পানি। বড় বিপদে আছি। তারেক সিগারেটে ঘন ঘন কয়েকটা টান দিয়ে বললো।

- বলিস কী! তুইও ফ্লাড ভিক্টিম? তোর এলাকায় কখনো পানি ওঠে বলে শুনিনি।

- আমিও তাই জানতাম। ভাড়া নেওয়ার সময় বাড়িঅলাও তাই বলেছিলেন। পানি উঠলেও ছোট নদীটার আশপাশে কিছু এলাকা ডুবতো। তিনি ওখানে বাড়ি করার পর অতদূর নাকি পানি কখনো আসেনি। তারেক বললো।

- হয়তো সত্য কথাই বলেছেন। এনামুল আনমনা গলায় বললো। কিছুক্ষণ পর, 'কী আর করা যাবে। বন্যার পানির ওপর মানুষের হাত নেই। নেক্সট ইয়ারেও যদি এরকম হয়, তুই বাসা পাল্টে ফেলিস।'

- কিন্তু দোস্তো, এত কম টাকায় এমন একটা ঘর পাবো কোথায়? এখন না হয় বন্যার পানি। জায়গাটা কী খোলামেলা। বাতাসের চোটে জানালা খুলে রাখা যায় না। তাছাড়া মকবুল সাহেব লোকটাও ভালো। বলেছে বিল্ডিং তুললে আমাকে একটা রুম দেবে।

- রুম দেবে বলেছে? নাকি ফ্ল্যাট দেবে? অন্য কোনো মতলব নেই তো? হাসতে হাসতে এনামুল বন্ধুর মুখের দিকে তাকায়।

- না রে! ওরকম কোনো সম্ভাবনা নেই। মকবুল সাহেবের বড় মেয়ে মাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার...।

- আজকালকার মেয়ে। দেখছিস না চারদিকে কী অবস্থা? দীনার সঙ্গে মডেলিং করে একটা মেয়ে, সেও নাইনে পড়ে। দেখে মনে হয় ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।

- সিগারেটটা পায়ের নীচে পিষে তারেক বললো, ওগুলো বখা মেয়ে। খোঁজ নিয়ে দেখিস, অ্যাবরশানও করে ফেলেছে।

- সেই একই কথা দাঁড়ালো। ক্লাস এইট-নাইনের মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হতে পারে না? তোরইবা এমন কী বয়স হয়েছে। তাছাড়া, মকবুল সাহেব তোর সঙ্গে এখনই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে না। ধর কমপক্ষে তিন বছর। ততদিনে মেয়েটা পুরো যুবতী। দারুণ দেখতে হবে রে তারেক। ও বাসা ছাড়িস না।

তারেক বন্ধুর পাশাপাশি নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে এলিফ্যান্ট রোডের দিকে। হঠাৎ ওর তিন্নির কথা মনে পড়লো এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে যেন একটা শিহরণ খেলে গেলো। তিন্নির মেজোখালার নরম-গরম হাতটা ও নিজের মুঠোয় চেপে রেখেছিলো কিছুক্ষণ। সে বাসায় গিয়ে কি তরুণীকে ও আবার দেখতে পাবে? ভেতরটা খুব আনচান করছে। কিন্তু গত রাতের ব্যাপারটা? নৌকায় অজানা উৎস থেকে ভেসে আসা সৌরভ, ঘরে পারিপাটি বিছানা, বিছানায় ফুলের তোড়া এবং সুরেলা মেয়েলী কণ্ঠে ওর নাম! কী হলো এসব।

- কী হলো তারেক? হঠাৎ খামোশ হয়ে গেলি যে! এনামুলের আচমকা প্রশ্নে তারেক যেন চমকে উঠলো। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললো, চল কোথাও গিয়ে নিরিবিলি বসি। তুই এসেছিস, ভালো হয়েছে। তোর সঙ্গে আমার কিছু জরুরী কথা আছে।

এনামুল তারেকের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললো, 'সারওয়ার্দি উদ্যানের দিকে যাওয়া যাক।' সন্ধ্যা হওয়ার দেরি নেই। তবে যথেষ্ট আলো আছে। চারদিকের মানুষজন, গাছপালা পরিষ্কার দেখা যায়। ওরা দু'জন আর্ট কলেজের সামনের গেট দিয়ে ঢুকে হাঁটতে হাঁটতে মাঠের পশ্চিম পাশ ধরে অনেক দূর চলে এলো। এ দিকটা নির্জন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গায়ে গা ঘেঁষে তরুণ-তরুণীরা বসে আছে। দু'একটা জোড়ার বসার ভঙ্গী চোখে লাগে। বেলেল্লাপনায় মেয়েরাও কম যায় না। এরকম দিনের আলোতে? ফুটপাত দিয়ে লোক চলাচল করছে। পোশাক-পরিচ্ছদে, চেহারায় এদের ছাত্র-ছাত্রীই মনে হয়। আবার নাও হতে পারে। এ দিকটায় 'ছুটা' পতিতা এবং দালালদের খুব আনাগোনা। খদ্দেররাও জানে ব্যাপারটা। তবে এটা ঠিক, যত দিন যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশার ধরন পাল্টাচ্ছে। এ ব্যাপারটা কিন্তু একদিক থেকে ভালো। ভালোবাসার তীব্র প্লাবনে যদি খুনোখুনির উন্মাদনাটা ভেসে যেতো।

- কী ব্যাপার। কী চিন্তা করছিস? চল কোথাও বসি। এর চেয়ে ভালো জায়গা পাবি না। মেইন গেটের দিকে দেখছিস না কী ভিড়! এনামুল অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠলো।

চমকে উঠে তারেক বললো, তাহলে এখানেই বসি। ও বসে পড়লো। ওর সঙ্গে সঙ্গে এনামুলও বসে। ওদের থেকে পনেরো-বিশ হাত দূরে একটা জোড়া। মেয়েটা উঠে পড়তে চাইছে। ছেলেটা তরুণীর হাত ধরে টেনে বসিয়ে রাখছে। এরা খুব সম্ভব জেনুইন ছাত্র-ছাত্রী।

- এই বাদাম! ছোকরা বাদামঅলা যাচ্ছিলো। এনামুল বাদাম কিনলো। ঠোঙা থেকে নিয়ে দুই বন্ধু বাদাম চিবায়।

- এনামুল, একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। বেশ মিস্ট্রিয়াস। আমি ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না। তারেক কয়েকবার কেশে গলা পরিষ্কার করে বললো।

- শুনি শুনি? এনামুলের চোখে-মুখে কৌতূহল উপচে পড়ে যেন।

তারেক অনেকক্ষণ সময় নিয়ে দু'দিন আগে বাসায় ঘটে যাওয়া ব্যাপারটা এনামুলকে বললো। বলতে বলতে ওর মনে হলো, নৌকার ব্যাপারটাও স্বাভাবিক ছিলো না। এখন মনে হয় নৌকায় অদৃশ্য কিছু একটা ছিলো। নৌকাটাইবা এসেছিলো কোত্থেকে? এনামুলকে সে এ ব্যাপারটাও বললো।

এনামুল ঝিম ধরে বসে থাকে। আনমনে বাদাম চিবায়। সিগারেট ধরায় একটা।

- ব্যাপারটা স্ট্রেঞ্জ। আচ্ছা, তুই ভূত বিশ্বাস করিস?

- তোর সঙ্গে আমার কতদিনের বন্ধুত্ব? এনামুলের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তারেক বললো।

- দশ বারো বছর। এনামুল অবাক হয়ে বললো।

- এসব ব্যাপারে আমার কখনো ইন্টারেস্ট দেখেছিস?

- তা দেখিনি। বুঝতে পেরেছি তুই কী বলতে চাস। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, কেউ বিশ্বাস না করলেও ভূত-প্রেতের কিছু এসে যায় না। উনারা আছেন। মানুষ সৃষ্টির পর থেকেই উনারা আছেন।

তারেক শব্দ করে হেসে বললো, 'বাহ্ এ যে দেখছি রীতিমতো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

- ঠিক তাই। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, কোনো কোনো সময় জ্বিনপরী মানুষের জগতে চলে আসে। মানুষের ওপর ভর করে। এনামুলকে এবার কিছুটা গম্ভীর শোনালো।

- আমার ওপর পরীর নজর পড়েছে, তাই তো? তারেক বললো।

- ঠিক পরী কিনা বলতে পারবো না। তবে সেটা বাস্তব পৃথিবীর বাইরের কোনো সত্তা। অতৃপ্ত আত্মাও হতে পারে। ওগুলোর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়।

- তোর মতো একজন লেখাপড়া জানা মানুষ...? আসলে অসুখে ভুগে ভুগে তোর মধ্যে কিছু ফ্যান্টাসি জন্ম নিয়েছে। একটানা তিন চারদিনের জ্বরে মানুষ কতকিছু দেখে। এগুলো সব ঘোরের চিন্তা। সব অবাস্তব। তারেক বললো।

-দোস্তো কয়দিন পরেই বুঝবা। আমি পরিষ্কার দেখতেছি, এক পরী তোমার প্রেমে পড়ছে। ভয়ের কিছু নাই। প্রেমে রেসপন্স পেলে পরীরা মানুষের ক্ষতি করে না। ওরা প্রেমের অনেক আর্ট জানে।

-এনামুল, এমনভাবে বলছিস যেন তুই এ ব্যাপারে এক্সপার্ট। তুই কোনো পরীটরীর চক্করে পড়েছিলি নাকি? বেশ উদগ্রীব গলায় তারেক বললো।

এনামুল চুপ করে থাকে। হঠাৎ মনে হলো গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। বেশ কয়েক মিনিট পরে বললো, আমার জীবনে ওসব ঘটেনি। ঘটলে খুশি হতাম। তবে আমার এক মামাতো ভাইয়ের বউ ছিলো পরী। কেউ কিছু জানতো না। বিয়ের পর জামাল ভাই ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেন যে, উনি যাকে বিয়ে করেছেন সে একজন পরী।

- আচ্ছা! পরীর সঙ্গে সংসার করলো শেষ পর্যন্ত?

- না, শেষটা মধুর হয়নি। আমার ভাইটা এক অদ্ভুত সারকামস্টেন্সে মারা গেছে। আমার বিশ্বাস ওর পরী-বউই ওকে মেরেছে।

- কী কারণে? দারুণ অবাক হয়ে যায় যেন তারেক।

- বিয়ের পর অফিসের এক তরুণী বসের সঙ্গে জামাল ভাইয়ের এ্যাফেয়ার হয়েছিলো। দুর্ভাগ্য আর কী! আমার ধারণা পরী সেটা বুঝতে পেরেছিলো। পরীরা সব বুঝতে পারে, জানিস তো?

- হুঁ। ঐ পরী ম্যাডাম জেলাস হয়ে পরে হাজব্যান্ডকে খুন করে। এই তো?

- আমার বিশ্বাস, তাই।

- তুই এমন একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমাকে কখনো বললি না? তারেককে বিস্ময়ের ঘোর চেপে ধরে।

-আরে, এটা ঘটে আমি যখন স্কুলে এইটে পড়ি। জামাল ভাই বয়সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড় ছিলেন। তাছাড়া আমি ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিলাম। আজ তোর কথার প্রসঙ্গে মনে পড়লো।

-ও। ঝিম ধরে থেকে তারেক কিছু ভাবে।

ফিকে হয়ে অন্ধকার নামছে। চারদিক অস্পষ্ট দেখায়। আশপাশের তরুণ-তরুণী জোড়ার বেশ কয়েকটা উঠে গেছে। পুলিশের টহল দেখা যায়। দূরে চার-পাঁচটা ছেলে একটা ব্যান্ডগ্রুপের জনপ্রিয় একখানা গান সমস্বরে গাইতে গাইতে মাঠের পশ্চিমে মেইন গেটের দিকে চলে গেলো। বোধহয় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশানে ব্যান্ডশো ছিলো। ঢাকায় এখন অনেক ব্যান্ড গ্রুপ। সবগুলো জনপ্রিয়। আর কত যে পপুলার সিঙ্গার বেরিয়েছে! কয়েকজন তো রীতিমতো সুপারস্টার। দীনাকেও এরকম এক স্টার ফোন করে। মাঝে মাঝে ফোন রিসিভ করে এনামুল। ছেলেটার ফ্যাসফ্যাসে গলা। ও কীভাবে স্টার হলো, এনামুল ভেবে পায় না। তবে ছেলেটা অতিশয় ভদ্র, দীনাকে চাইবার আগে এনামুলের শরীরের খোঁজখবর নেয়। এ ডাক্তার, সে ডাক্তারের নাম সাজেস্ট করে। দীনা বলে, এনামুলের সঙ্গে বিয়ের আগে থেকে ঐ গায়কের সঙ্গে ওর পরিচয়। হতে পারে। এনামুল এ নিয়ে বিশেষ ভাবে না। দীনার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চিন্তা করার আগ্রহ ওর আর নেই।

- ও এনামুল! তারেক আচমকা ডাকলো।

- বল।

- আমরা দু'জনে মিলে শোকসভা করছি নাকি!

এনামুল হো হো করে হেসে উঠলো।

-তুই আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলি। শেষ পর্যন্ত আমার ওপর পরী ভর করলো? এখন উদ্ধারের পথ কী? দুশ্চিন্তার ভাব করে তারেক বললো।

- আরে উদ্ধারের কী দরকার। পরীর সঙ্গে প্রেম কর। এরকম ভাগ্য ক'জনের হয়? পরীর সঙ্গে ভালোবাসা। তুই ওর কাছে যা চাইবি, সব পাবি।

তারেক বোকার মতো হেসে বললো, 'মানে? পরীরা মানুষকে কী দেবে? ছোটবেলায় রূপকথায় পড়েছি, ওদের দেশভর্তি হীরা, জহরৎ, চুনী, পান্না। ওসব চাইতে বলছিস?

- কী চাইতে হবে আমি বলে দেবো? এনামুল বললো ভারি গলায়।

তারেক ঘনঘন কয়েকবার শ্বাস টানলো। সেই সুঘ্রাণটা, যেটা ও ক'দিন আগে পেয়েছিলো। অবিকল সেই গন্ধ। এ কোনো ফুলের গন্ধ নয়। ও আড়চোখে এনামুলের দিকে তাকালো। সে-ও গন্ধটা পাচ্ছে নাকি? তারেক বোঝার চেষ্টা করলো। এনামুলের মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না। ও তাহলে কিছু বুঝতে পারেনি। এখনি উঠে পড়তে হয়। এনামুল গন্ধটা পেলে পরী-টরী নিয়ে মহা উৎসাহে আজগুবি কাহিনী বলা শুরু করবে। এমনিতে আজ থেকে তারেকের জান কয়লা হয়ে যাবে। এনামুল রোজই খুঁজে বের করবে ওকে। তারপর জানতে চাইবে পরী সম্পর্কে সর্বশেষ খবর। কেন যে ব্যাপারটা এনামুলকে ও বলতে গেলো। সব ওর মনের ভুল। বিছানায় ফুলের তোড়াটা মকবুল সাহেবের বড় মেয়ে শিউলিও রেখে যেতে পারে। আজকালকার মেয়ে। হয়তো তারেককে নিয়ে ও রঙিন স্বপ্ন দেখছে। শিগগিরই নিশ্চয় চিঠি পাওয়া যাবে।

- এনামুল, এবার উঠতে হয়। নবাবগঞ্জ যেতে হবে। তারেক উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে।

-বাদ দে না আজ। একদিন না গেলে কিছু হবে না। অনেক দিন পর আমার ভালো লাগছে। এনামুলের গলায় এমন একটা অনুনয়ের ভঙ্গি আছে যে, তারেক দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এনামুল ছাড়া ওর আর কাছের বন্ধু নেই। ওর মনটা খুব পরিষ্কার। মাথায় প্রচুর বুদ্ধিও রাখে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জেনারেল হিস্ট্রিতে অনার্স পড়েছে। পাশ করার পর আর এমএ পড়েনি। তখন ফিলম্ কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলো। কঠিন অসুখটা না হলে ও জীবনে অনেক কিছু করতে পারতো। তারপর আছে দীনা। জেনেশুনে তিন হাত ঘোরা মেয়েটাকে ও বিয়ে করেছে। দীনার ভীষণ প্রেমে পড়েছিলো ও। বলতো, ওকে ছাড়া জীবন অর্থহীন। সেই পুরনো কথা আর কী। মডেলিং জগতের এক্সট্রা ধরনের মেয়ে দীনাকে নিয়ে এনামুলের প্রথম দুটো বছর বেশ সুখে কেটেছে। সংসারে ছোটখাটো অভাব ছিলো, এরপরেও ওদের দাম্পত্য জীবনে যথেষ্ট আনন্দ ছিলো। অবাক হয়ে দু'জনকে দেখতো তারেক। তখন ও ওদের বাসার বাইরের দিকে একটা রুম সাবলেট নিয়ে থাকে। গোলমাল দেখা দিলো দীনা একটা বড় কসমেটিকস কোম্পানির হয়ে বিজ্ঞাপনে মডেলিং শুরু করার পর। শুরুতেই দীনার বিজ্ঞাপন হিট। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, সিনেমা সব মাধ্যমে। টিভিতে টয়লেট সোপের জিঙ্গলটাও হয়েছিলো দারুণ। অনেক দিন ওটা ছিলো মানুষের মুখে মুখে। এরপর দীনার ডিমান্ড কে দেখে। তরতর করে উঠতে থাকে ও। আর এক ধরনের ধূসর তলানীর দিকে নেমে যেতে থাকে এনামুল। দীনার তখন থেকেই ওপর মহলে ওঠা-বসা শুরু হয়। দামী গাড়ি নিয়ে বিজনেস ম্যাগনেটরা বাসায় আসে। এনামুল চোরের মতো আড়ালে আড়ালে থাকে। ঐ সময় থেকে তার জ্বরের পর্বটা শুরু হয়, চেহারা ভাঙতে থাকে, চুল কমতে কমতে মাথার সামনের দিকটা ফাঁকা হয়ে যায়। খুব বাজে হয়ে যায় ওর চেহারা! দীনার পাশে স্বামী হিসেবে ওকে তখন আর মানাতো না। এখন তো একেবারেই নয়। এখন সে দীনার ফ্ল্যাটে আছে শুধু মেয়েটার দয়ার ওপর। তাছাড়া দীনা নিশ্চয় বোঝে, লোক দেখাবার জন্য হলেও একজন স্বামী থাকা দরকার। একদম একা থাকলে ওকে লোচ্চা ক্লায়েন্টরা খুবলে খেয়ে ফেলবে। এনামুল আছে এখন দীনার গার্ড এবং বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে। বেচারা! দীনার বাসা ছাড়া ওর গতিও নেই। জ্বরটা এলে ও যাবে কোথায়? দীনা অন্ততপক্ষে ঐ সময়টায় তার খোঁজখবর নেয়। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে। হোক না অভিনয়। এনামুল সেবাটুকু তো পাচ্ছে। এটুকু না পেলে ও বহু আগেই মারা যেতো। এনামুল অবশ্য বলে, দীনা ওকে আগের মতোই ভালোবাসে।

বেচারী সেটা প্রকাশ করার সময় পায় না। তখন এনামুলের জন্য তারেকের করুণা হয়।

এনামুলের জীবনে একটা পরী আসা দরকার। এমন এক পরী, যে সোনা-রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ওর জীবনটা পাল্টে দিতে পারবে। কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে না। তারেককে আজ নবাবগঞ্জ যেতেই হবে। আজ ঐ বাসা থেকে টাকা পাওয়া যাবে। হাত একদম খালি।

- এনামুল, আজ থাক। আরেক দিন। সারাদিন আমরা একসঙ্গে থাকবো। ঐ দিন নো টিউশানি। পানিটা শুকালে আমার ঘরেও আড্ডা হতে পারে। যদি ঐ সময় পরীটা ...।

- আচ্ছা ঠিক আছে। এনামুল উঠে দাঁড়ালো। দু'জন পেছন ফিরে আবার আর্ট কলেজের সামনের গেটটা দিয়ে ফুটপাতে উঠে আসে। শাহবাগের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এনামুল বললো, তারেক পরীর ব্যাপারটা হালকাভাবে নিস না। ও যদি তোর প্রেমে পড়ে, তাহলে তোকে রেসপন্স করতেই হবে। নইলে বিপদ আছে।

- তা তো বটেই। হাসতে হাসতে তারেক বললো। ওকে এখন শাহবাগ থেকে বাসে করে যেতে হবে গুলিস্তান। সেখান থেকে পিকআপ ভ্যান ধরনের এক গাড়িতে ঠাসাঠাসি করে নবাবগঞ্জ। কী যে কষ্ট!

॥তিন ॥

অনেক দিন পর এনামুলের মেজজাটা আজ ফুরফুরে। এমনিতে সারাক্ষণ বিষাদের একটা ছায়া ওকে ঘিরে থাকে। জ্বরে ভুগে ভুগে ওর মেজাজটাও তিরিক্ষি হয়ে গেছে। দীনার সঙ্গে ওর ঝগড়া করার অনেক কারণ আছে। কিন্তু ইদানীং সে অকারণেও দীনার সঙ্গে খিটিমিটি বাঁধায়। দীনা ছাড়ার পাত্রী নয়। সেও ফুঁসে ওঠে।

আজকের সকালটা এ বাসায় একটা ব্যতিক্রম। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই বাসায়, কিন্তু হৈ চৈ বা চীৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরপর দীনার গলা শোনা যাচ্ছে। ও ব্যালকনির টব পরিষ্কার করছে, সঙ্গে কিশোরী কাজের মেয়ে মর্জিনা। এনামুল সাততলায় বেডরুমের জানালার পাশে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বাইরে তাকিয়ে আছে। আজ সারাদিন হরতাল। নীচে রাস্তায় বেশকিছু রিক্সা চলছে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি, এ্যাম্বুলেন্স। তবে হরতালের পরিস্থিতি ওপর থেকে শান্ত বলে মনে হচ্ছে। এনামুল ইচ্ছে করলে রিক্সা নিয়ে অফিসে যেতে পারতো। কিন্তু আজ ওর দীনার আশপাশে থাকতে খুব ইচ্ছে করছে। বহুদিন পর আজ দীনাকে লক্ষ্মী গিন্নির ভূমিকায় দেখা যায়। শাড়ি পরে না ও। আজও জিনসের প্যান্ট এবং ওপর দিয়ে ছেড়ে দেয়া ঢোলা হাওয়াই শার্ট পরে আছে। মাথার ঘন, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল পেছন দিক দিয়ে ছেড়ে দেয়া। ঘরে বসে জানালা দিয়ে এনামুল দেখতে পায়, দীনা কাঁচি দিয়ে অর্কিডের মরা পাতা কাটছে। দৃশ্যটা মধুর। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনো উবু হয়ে ওর ফুলগাছ পরিচর্যার দিকে মুগ্ধভাবে তাকিয়ে থাকে এনামুল। ওদের দিনগুলো যদি এভাবে কেটে যেতো! দীনার মডেলিং বা টিভিতে নাটক করা নিয়ে এনামুলের কোনো আপত্তি নেই, ও মাঝে মাঝে গভীর রাতে বাড়ি ফেরে, সেটাও মেনে নিতে পারে। কিন্তু আজকে যেমন, নিজের সংসারের প্রতি যদি ওর একটু টান থাকতো! ক'দিন ওরা একসঙ্গে খায় না। আজ খাবে। দীনা স্পেশাল কিছু রাঁধছে। বেশ কয়েকবার কিচেন থেকে ওর গলার শব্দ পাওয়া গেছে। ডিভিডি প্লেয়ারে একটা সিডি চড়িয়ে দেয় এনামুল। হালকা মিউজিক। দীনা জানালা দিয়ে বেডরুমে এনামুলের দিকে তাকালো। হাসিমুখে ভুরু নাচিয়ে নিঃশব্দে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার?' এনামুল বললো, 'ভিতরে আসো।'

- দাঁড়াও আর দশটা মিনিট। দীনা হাত তুলে বললো। দীনার দিকে তাকিয়ে থাকে এনামুল। ওর বেপরোয়া জীবনের জন্য দোষ দিতে ইচ্ছে করে না। এনামুল জানে, দীনার ভেতরে একটা ক্ষত আছে। ও বাইরে যত হৈ চৈ করুক না কেন, এনামুল জানে, মাঝে মাঝে সেই ক্ষত থেকে প্রচুর রক্ত ঝরে। মাঝরাতে ধড়মড় করে জেগে উঠে ও দেখে, দীনা দু'হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা খুঁজে পায় না এনামুল। কিছুক্ষণ দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ও মোলায়েমভাবে স্ত্রীর পিঠে হাত বুলায়। ওতে দীনার কান্নার তোড় বেড়ে যায় আরো।

– তোমার গ্রামের দাদী কত ওষুধ জানে। আমার জন্য কিছু করতে পারে না? কাঁদতে কাঁদতে একদিন বলেছিলো দীনা।

– দাদীকে আমি সব বলেছি দীনা। দাদী ওষুধও জানে। কিন্তু যে গাছের ছাল থেকে ওষুধ হয়, সেটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের গ্রামে একটা ছিলো, কামলারা সেটা কেটে ফেলেছে। ওখানে এখন ইটের ভাটা।

– সব আমার কপাল। আমার কপাল। কাজের বুয়াদের তিনটা চারটা করে বাচ্চা। আল্লা আমাকে একটাও দিতে পারে না?

এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই এনামুলের। পৃথিবীর সমস্ত বন্ধ্যা নারীর ভেতর যে গুমোট হাহাকার, দীনার ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হবার নয়। কত ডাক্তার গাইনি দেখানো হলো ঢাকায়, দেশের বাইরে। সবার এক কথা, দীনা কোনোদিন কনসিভ করতে পারবে না। মাঝখানে একটা বাচ্চা দত্তক নেয়ার কথা বলেছিলো এনামুল। বহু দম্পতি এভাবে চমৎকার আছে। অনেক সময় খেয়ালই থাকে না, বাচ্চাটা ওদের সন্তান নয়। আর, যাকে দত্তক নেয়া হয়, সে আজীবন দত্তক নেয়া বাবা-মাকে আসল বাবা-মা হিসেবেই জেনে যায়। কোনো সমস্যা হয় না। যদি না কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ছেলে অথবা মেয়েটাকে ঘটনা বলে দেয়। শুরু থেকে দত্তক নেয়ার ব্যাপারে দীনা প্রবল আপত্তি করেছিলো। কৃত্রিম কোনো কিছু সহ্য করতে পারে না ও। ইদানীং এনামুল টের পায়, দীনার আপত্তির জোর কমে আসছে। কিন্তু এনামুলের যে কী হলো, ও নিজেই এ ব্যাপারে সায় দিতে পারছে না। মনের গতি-প্রকৃতি বোঝা মুশকিল। নিজের মনকেও মানুষ বুঝতে পারে না।

নীচে রাস্তার দিক থেকে একটা বোমা ফাটার শব্দ ভেসে এলো। এনামুল তাকিয়ে দেখে একটা জায়গায় ধোঁয়া উড়ছে, এদিকে ওদিকে দৌড়াচ্ছে লোকজন। দীনা ঘরে ছুটে এসে জানালায় দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ নীচের দৃশ্য দেখে বললো, 'ভায়োলেন্স হচ্ছে নাকি?' এনামুল দুই দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'নাহ্! পটকা ফাটিয়েছে। ওরকম দু'একটা সবসময় ফাটে।'

দীনা বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। দখিন খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। চুলের গোছা উড়ে এসে দীনার মুখে পড়ে, ও বারবার হাত দিয়ে তা সরিয়ে দেয়।

– অনেক কাজ করলে। এনামুল বললো।

– হ্যাঁ। গাছগুলোর বারোটা বেজে গিয়েছিলো। মর্জিনা ঠিকমতো পানিও দেয় না। তুমি দিনের পর দিন বাসায় থাকো। তুমি তো গাছগুলোর একটু যত্ন করতে পারো। দীনা এনামুলের দিকে পাশ ফিরে হাতে মাথার ভর রেখে বললো।

– আরে আশ্চর্য, আমি যত্ন করি না কে বললো! আমি কেয়ার না নিলে সবগুলো গাছ কবে মরে যেতো। মর্জিনাকে জিজ্ঞেস করে দেখো আমি নিজে টবে পানি দেই কিনা।

– মর্জিনা! এনামুল ডাকলো।

মর্জিনা জানালা দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে ভেতরে তাকালো।

– কিছু না। তুই কাজ কর। দীনা মর্জিনাকে বললো।

– ওর মুখেই শুনতে।

– মেয়েটাকে এমবারাস করার দরকার নাই। তোমার কাজের দৌড় আমি জানি। হয়তো এক-আধদিন একটা মরা পাতা ছিঁড়েছো। বা কী মনে করে হয়তো টবে পানি দিয়েছো। এটাকে গাছের যত্ন বলে না। দীনা বললো।

দীনার কথার কাছে এনামুল যেন হার মেনে যায়। দীনা খুব মিথ্যা বলেনি। এনামুল সারাক্ষণ ঘরেই থাকে। ছ'বছর হলো ওরা এই ফ্ল্যাটে উঠেছে। এ সময়টুকুতে ও ক'বার ব্যালকনিতে গেছে, গুনে গুনে বলতে পারে। টবের ফুলগাছ, লতানো অর্কিড ওরও ভালো লাগে। কিন্তু অসুখে ভুগে ভুগে গাছপালা, লতাগুল্মের দিকে

তাকাবার মনটা ওর মরে গেছে। ও খেয়াল করেছিলো, দীনা বেশ কিছু টব বসিয়েছে ব্যালকনিতে। কয়েকটা অর্কিড খুব দামী। পানির অভাবে কয়েকটা গাছ মরে যাচ্ছিলো, মর্জিনাকে সঙ্গে নিয়ে ও টবে পানি দিয়েছে। শেষবার দিয়েছে তিন-চার মাস আগে।

– ভলিউমটা কমাও। দীনা বললো।

এ মিউজিকটা কয়েক জায়গায় বেশ চড়ে যায়। কিন্তু খারাপ লাগে না। আগে দীনা কখনো এ নিয়ে কথা বলেনি। আজ হলো কী?

– তোমার ফেভারিট মিউজিক। এনামুল অবাক হয়ে বললো।

– এখন ভাল্লাগছে না। দীনা চিৎ হয়ে শুয়ে লম্বালম্বিভাবে হাত রাখলো চোখের ওপর।

– তাহলে বন্ধই করে দিই। এনামুল বললো।

– তাই দাও।

মাথা ধরেছে? এনামুল দীনার দিকে ঝুঁকে গেলো।

– একটু একটু।

দীনার এই এক শারীরিক সমস্যা। হঠাৎ হঠাৎ ওর মাথা ধরে যায়। আগে থেকে কিছু টের পাওয়া যায় না। এনামুল জানে, দীনার একটানা ঘুম হয় না। বিয়ের পর থেকেই ও দেখে আসছে, মাঝরাতে দীনা বিছানায় বসে আছে। অনেক সময় কাঁদে। শুয়ে থাকলেও প্রায় সারারাত এপাশ-ওপাশ করে। রোজই শোয়ার আগে দীনা ঘুমের ট্যাবলেট খায়। ওতে দীনার কাজ হয় না।

– জানো, এক পরী তারেকের প্রেমে পড়েছে। আচমকা এনামুলের মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো।

কপাল থেকে হাত সরিয়ে দীনা এনামুলের দিকে ফিরে শুলো।

– ইন্টারেস্টিং! গাঁথলো কীভাবে? সুন্দরী ছাত্রী নাকি? তারেক ভাই যা হ্যান্ডসাম। দীনা বললো।

দীনার শেষের কথাটায় এনামুলের বুকের কোথাও একটু জ্বলে উঠলো। এখন ও সেটাকে পাত্তা না দিয়ে বললো, 'দীনা তোমাকে কীভাবে বোঝাবো। পরীর মতো সুন্দরী মেয়ে না। সতি সত্যি পরী।'

বিছানায় উঠে বসলো দীনা। তারপর মুখের অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে বললো, 'হোয়াট! সত্যি সত্যি পরী মানে?'

– হ্যাঁ দীনা। সত্যি সত্যি পরী। তারেক নিজেই অবশ্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করছে না। ওর ধারণা সব মনের ভুল।

– বলো না কী হয়েছে। আহলাদী গলায় দীনা বললো।

এনামুল তারেকের মুখে পরীবিষয়ক বৃত্তান্ত যা যা শুনেছে, তার পুরোটা দীনাকে বললো। ওর চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে। মুখটা কিঞ্চিৎ হাঁ।

– তারেক ভাইকে সামনের ফ্রাইডেতে বাসায় আসতে বলো না। দুপুরে খাবে। আমি কোথাও যাবো না। আমি ওর মুখে সব ঘটনা শুনতে চাই। একটা পরী, আরেকটা মানুষ... এদের মধ্যে অ্যাফেয়ার... তারপর আরো কতো কিছু...। দীনা বিড়বিড় করে।

– তাহলে শুক্রবার তারেককে বাসায় আসতে বলি। আমি অবশ্য আগেই আসতে বলেছিলাম। এনামুল বললো।

– না, শুক্রবারেই বলো। ঐদিন আমি একদম ফ্রি। দীনা হঠাৎ চুপ করে যায়। কয়েক মিনিট কিছু চিন্তা করে

বললো, 'আচ্ছা মানুষ আর পরীতে... ধরো যদি ওটা হয়... তাহলে বাচ্চা হবে?'

এনামুল হেসে উঠলো, 'ওটা মানে?'

দীনা বললো, ওটা মানে ওটা। ন্যাকা। দুদু খায়। বলো না, বাচ্চা হবে নাকি?

– সেটা আমি কী করে বলবো। এ রকম কখনো হয়েছে বলে আমি শুনিনি। তবে এ নিয়ে গালগল্প আছে। রূপকথা আছে। ফিল্ম-টিল্মও হয়ে থাকতে পারে।

দীনা একটা বালিশ কোলে নিয়ে উবু হয়ে চেপে ধরে বললো, 'ইস্, যদি সত্যি সত্যি হয়ে যায়! বাচ্চাটা দেখতে যা হবে না! একদিকে পরী, অন্যদিকে তারেক ভাইয়ের মতো হ্যান্ডসাম ইয়াংম্যান...।'

আবার জ্বলুনি শুরু হলো এনামুলের। তারেক হ্যান্ডসাম, এটা বারবার বলার কী আছে? ওর চেহারাও খারাপ ছিলো নাকি? অসুখটা না ধরলে...। পরীরা অনেক কিছু জানে। তারেককে দিয়ে পরীর কাছ থেকে একটা ওষুধ নিতে হবে ওর অসুখের জন্য।

দীনা এনামুলের মুখের ওপর হালকা কালো ছায়াটা খেয়াল করলো। ও ভীষণ শার্প। ছুরির ফলার মতো।

– কী হলো, চুপ মেরে গেলে যে? তারেক ভাইকে হ্যান্ডসাম বলেছি, এজন্য জেলাসি হচ্ছে? ঠিক আছে, আর বলবো না। দীনা হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে একটা পা লম্বা করে মেলে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে এনামুলের তলপেটে খোঁচা দেয়।

–ফ্রেন্ডের প্রশংসা করেছি, এমনি মুখ কালো হয়ে গেলো? এনামুলের তলপেটে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বললো দীনা। ও কিন্তু হাসছে আগের মতোই।

– আরে, কী শুরু করলে দীনা? তারেক আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বলতে পারো, আমার একমাত্র ক্লোজ ফ্রেন্ড। ওর ওপর আমি জেলাস হবো? তবে ওর পরীটাকে আমি চাই। এনামুল নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো।

– কী বললে? ফ্রেন্ডশিপের এই নমুনা? বন্ধুর প্রেমিকাকে নিয়ে টানাটানি? হাসি হাসি মুখ করে থাকলেও দীনাকে সিরিয়াস দেখায়।

– তারেক তো পরী-টরী বিশ্বাসই করে না। কিন্তু আমি বোধহয় করি। জানো, আমার দাদী বলতেন, পরীদের অনেক ক্ষমতা। ওরা পারে না এমন কাজ নেই। পরীটার কাছে আমার অনেক কিছু চাইবার আছে। এনামুলকে অন্যমনস্ক দেখায়।

সামান্য গম্ভীর হয়ে দীনা বললো, 'কি চাইবে? ও যদি তোমাকেই চেয়ে বসে? তোমাকে বিয়ে করতে চায়?'

– দূর পাগলি। তোকে নিয়ে আমি বেশ আছি। আমি তোকে আরো কাছে পেতে চাই। সারাক্ষণের জন্য পেতে চাই। আবেগে এনামুলের গলা গাঢ় হয়ে আসে।

– কী চাইবে তুমি বলো না। অধৈর্য হয়ে ওঠে দীনা।

– আমি ওর কাছে একটা ওষুধ চাইবো, যেটাতে তোমার বাচ্চা হবে।

এনামুলের চোখে চোখ রাখে দীনা। একটানা তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ দুটো এক সময় ছলছল করে ওঠে।

এনামুল উঠে গিয়ে দীনাকে জড়িয়ে ধরে। বেশ কয়েক মিনিট ও স্ত্রীকে জাপ্টে ধরে থাকে। এক সময় দীনা এনামুলের কানের কাছে মুখ এনে বললো, 'তোমার অসুখটা ভালো হওয়ার জন্য তুমি ওষুধ চাইবে না?'

এনামুল মাথা ঝাঁকায়। জানালার ওপাশে ব্যালকনিতে মর্জিনাকে দেখা গেলো। ও এখনো কাজ করছে। দীনা উঠে গিয়ে পর্দাটা টেনে দিয়ে এলো।

॥ চার ॥

তিন্নি পড়ার টেবিলে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। প্রতি পনেরো-বিশ মিনিট পর ও উঠে যায়। একবার পানি খাওয়া, একবার বাথরুম, একবার টিভি সিরিয়ালের একটা ইম্পর্ট্যান্ট সিন, আর ফোন ধরা তো আছেই। এভাবে ছাত্রী পড়ানো যায়? তারেকের মনোযোগ ছুটে যায়। অথচ মেয়েটার মাথা ভালো। পড়াশোনায় একটু মন লাগালে ওর রেজাল্ট খুব খারাপ হবে না। মেয়েটা অংক এবং ইংরেজি দুই বিষয়েই ভালো। অথচ এ দুটো সাবজেক্ট সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের আতঙ্ক।

তিন্নির মা দুরারোগ্য ক্যান্সারে ভুগছেন। দু'বছর ধরে বিছানায়। দু'তিন মাস পরপর সিঙ্গাপুর অথবা লন্ডন গিয়ে চেকআপ করিয়ে আসেন। সঙ্গে যান তার এক বড় ভাই। তিন্নির বাবার দুনিয়া জুড়ে ব্যবসা। কী ব্যবসা তারেক জানে না। তবে ভদ্রলোকের ঘন ঘন ইউরোপ যাওয়া থেকে ও অনুমান করে, তার গার্মেন্টসের ব্যবসা। যখনই ও তিন্নিকে ওর বাবার কথা জিজ্ঞেস করে, উত্তর আসে, 'ড্যাডি তো বেলজিয়াম।' কোনো দিন, 'ড্যাডি আজ সকালের ফ্লাইটে প্যারিস গেলো।' আবার আরেক দিন, 'ড্যাডি লাস্ট নাইটে লন্ডন গেছে।' এ রকম ব্যস্ত তিন্নির বাবা। সংসারে তাঁর মন দেয়ার সময় নেই। তিন্নি যে এবার এসএসসি দিচ্ছে, এটাও বোধহয় তিনি জানেন না। তিন্নি কিন্তু ড্যাডি বলতে পাগল। ড্যাডি ওর কোনো সাধ অপূর্ণ রাখতে চান না। ভদ্রলোক মেয়েকে অতিরিক্ত লাই দিয়ে যাচ্ছেন। দু'হাতে টাকা খরচ করে ও। ওর বয়সী কোনো মেয়ের হাতে এই পরিমাণ টাকা তারেক জীবনে দেখেনি।

যা হোক, তিন্নি একেবারে লাগামহীন নয়। ও বাড়িতে একজন গার্জেন আছেন। তিনি তিন্নির বিধবা বড়খালা। তিনিই এ সংসারটার হাল ধরে রেখেছেন, দেখভাল করছেন তিন্নি এবং তার দু'বছরের ছোট ভাইটার। এই বড়খালাই মাঝে মাঝে এসে তিন্নির পড়াশোনার খোঁজ নেন। তারেককে ভাগ্নির টিউটর হিসেবে ইনিই ঠিক করেছিলেন। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয় না, ইনি তিন্নির খালা। তিন্নি ছটফটে, চঞ্চল। ইনি শান্ত এবং সৌম্য প্রকৃতির। কথা বলেন ধীরে। অবশ্য কম বয়সে বিধবা হওয়ার জন্যও তাঁর মধ্যে এই ধীরস্থির ভাবটা এসে থাকতে পারে। তারেকের ভালো লাগে মহিলাকে। তিন্নির মাকে ও কোনোদিন দেখেনি। তবে তিন্নির মুখে প্রায়ই ওঁর কথা শোনে।

বাসার ছাদে তিন্নির বার্থডে পার্টির দু'দিন পর তারেক ও বাড়িতে ঢুকতেই মেজোখালার মুখোমুখি গিয়ে পড়লো। বুকে ধুকপুক শুরু হয়ে গেলো তারেকের। কারণ সে-ও মনেপ্রাণে চাইছিলো, তিন্নিদের বাসায় গিয়ে যেন মেজোখালাকে দ্যাখে। এ তরুণী তিন্নির কার্বন কপি। চেহারায় মিল আছে, তিন্নির মতোই ছটফটে। বড়বোনের মতো এর রূপে স্নিগ্ধতা নেই, আছে এক ধরনের মাদকতাময় লাবণ্য।

– আমি খুব লাকি। আজ সন্ধ্যায় বাসায় চলে যেতাম। যাক বিকেলটা আপনার সঙ্গে কাটবে। আপনার সময় আছে তো তারেক ভাই?

তারেক একটা ছোট ভিরমি খেলো। ওর নাম ধরে ডাকা শুরু করেছে। অবশ্য রোমাঞ্চ হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করে কিভাবে।

– কিন্তু আমি যে তিন্নিকে পড়াবো সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারেক ড্রইংরুমের সোফায় বসতে বসতে বললো।

– তিন্নি আজ পড়বে না, তারেক ভাই। দাঁড়ানো অবস্থায় দুটো বাহু আড়াআড়ি ভাবে সামনে রেখে খানিকটা কুঁজো হয়ে তরুণী বললো।

– পড়বে না মানে? তারেক অবাক হয়ে বললো।

– ওর এক বন্ধুর বার্থডে পার্টি। উত্তরা গেছে। তরুণীর মুখে দুষ্টু হাসি।

– বিশ্বাস করলাম না । ও এতোটা ইরেসপনসিব্‌ল্ হতে পারে না।

– তারেক ভাই। সত্যি বলছি। ও যেতে চাইছিলো না। ওকে জোর করে নিয়ে গেছে। একজন নয়। দশ বারোজন মেয়ে এসেছিলো। আমাকেও নিতে চেয়েছিলো। আমি যাইনি। আমার কাজ আছে। তরুণী ওর মুখোমুখি সোফায় বসে পড়লো।

– আমি তাহলে যাই। তারেক দাঁড়িয়ে পড়লো।

– চলে যাবেন? কথাগুলো বলে তরুণী তারেকের দিকে এমনভাবে তাকালো, যেন ঐ দু'চোখে পৃথিবীর সব মিনতি ধরা আছে।

– তারেকের বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দ হচ্ছে ভীষণ। ও নিজেই যেন তা শুনতে পায়। মাথার ওপর জোরে ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু ওর গরম লাগছে খুব।

– বসুন। গলার স্বর পাল্টে আদেশের ভঙ্গিতে বললো তরুণী।

তারেক নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতো বসে পড়লো।

– আমার গাড়ি আছে। আমি নিজেই ড্রাইভ করি। চলুন কোথাও যাই। মেঘলা দিন। খুব ভালো লাগবে। উছলে পড়া কণ্ঠে বললো তরুণী।

তারেককে যেন কোনো মায়াবিনী বশ করেছে। ও নিজের সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললো, 'চলুন।

একটু আগে তারেক জানলো তিন্নির মেজো খালার নাম রূপা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকোলোজিতে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ে। বাসা লালমাটিয়া। ওরা আশুলিয়ার দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভিং হুইলে বসা রূপা। ওর ঝকঝকে নতুন কার। এটা চালিয়ে ও ইউনির্ভাসিটি যাওয়া-আসা করে। আব্বু ড্রাইভার নিতে বলে। তিন্নি বলে, সে নিজেই গাড়ি চালাবে। বন্য ধরনের তরুণী।

রাস্তা ফাঁকা পেয়ে রূপা গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। তারেক ওকে স্পিড কমাতে বললো। রূপা বললো, 'ভয় লাগছে?'

তারেক বললো, 'ভয়ের ব্যাপার নয়।'

– তাহলে কী? ইয়াং মেয়েরা স্পিড কন্ট্রোল করতে পারে না? রূপা ঘাড়টা সামান্য ঘুরিয়ে তেরছা দৃষ্টিতে তারেকের দিকে তাকালো।

– কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। তারেক অল্প শব্দ করে হাসলো। তারপর, 'ইয়াং মেয়েরা কনসানট্রেট করতে পারে না। বেশির ভাগ মেয়ের মন বিক্ষিপ্ত থাকে।'

– আর? একজোড়া স্পিড ব্রেকারের সামনে রূপা গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো। ও দুটো পেরিয়ে ও আবার গতি বাড়িয়ে দেয়।

– এই তো। তবে আমি বলছি না, আপনি র‍্যাশ ড্রাইভ করেন। আপনি ভালো চালান। আমি শুধু স্পিডটা কমাতে বলেছিলাম।

– ডোন্ট ও'রি। আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে এ্যাক্সিডেন্ট করবো না। আর আপনি কি শোনেননি, ওয়েস্টে রিসার্চাররা আজকাল কী বলছে? ড্রাইভিং হুইলে এক হাত রেখে আরেক হাতে মিউজিকের ক্যাসেট পাল্টে দিলো রূপা। আগেরটা চড়া ছিলো। এটা মৃদু এবং সুরেলা।

– কী বলছে? তারেক ঘাড় পুরোটা ঘুরিয়ে রূপার দিকে তাকালো।

– বলছে, মেয়েদের নাইনটি পারসেন্ট ড্রাইভিংয়ের সময় কেয়ারফুল থাকে। ওদের এ্যাক্সিডেন্টের পারসেন্টেজ

পুরুষদের অর্ধেক। রূপাও মুখ ঘোরালো তারেকের দিকে। মুখে অহঙ্কারের চাপা হাসি।

– ওহ্ সরি। আমি এটা জানতাম না। আমি আদার ব্যাপারী, কিভাবে জাহাজের খবর রাখবো?

গাড়ি জয়দেবপুরের মোড়ে বাঁয়ে টার্ন নিলো। জায়গাটায় খুব জ্যাম। অজস্র রিক্সা বাস, টেম্পো এবং আরো নানা ধরনের যানে মোড়টায় জট পাকিয়ে রয়েছে। এখান থেকে বেরুতে দশ মিনিট লেগে গেলো। রূপা অভিজ্ঞ চালকের মতো গাড়িটা আশুলিয়ার রাস্তায় বের করে এনে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছাড়লো। এ রাস্তায়ও অনেক গাড়ি। অগত্যা রূপাকে গতি কমাতে হয়।

– কী যেন বলছিলেন তারেক ভাই? আদার জাহাজ? রূপা ধীরে সুস্থে বললো।

– তারেক হাসতে হাসতে বললো, 'আদার জাহাজ নয়। আদার ব্যাপারী।'

– ব্যাপারী মানে?

– ব্যাপারী মানে ব্যবসায়ী।

– কে আদার ব্যবসায়ী? রূপা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো।

– তারেক হাসি হাসি মুখে বললো, 'আমি।' আমি আদার ব্যাপারী। মানে তুচ্ছ, এলেবেলে ব্যবসায়ী। নৌকা নিয়ে কারবার। জাহাজ বিশাল ব্যাপার। আমি জাহাজের খবর দিয়ে কী করবো?

– উহ্, বুঝতে পারছি না। আসলে আপনি কী চাইছেন, তারেক ভাই? অস্থির শোনায় রূপার গলা।

– বলতে চাইছি, আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। গাড়ির খবর দিয়ে আমি কী করবো?

– নো, তারেক ভাই। দিস ইজ টু মাচ। কে বললো আপনি সাধারণ। ইউ আর এক্সট্রাঅর্ডিনারি। ইউ হ্যাভ নো প্যারালাল। শেষদিকে রূপার কণ্ঠ আবেগে আর্দ্র হয়ে ওঠে।

তারেক কী বলবে বুঝতে পারছে না। রূপা নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে যায়। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে খুব গাঢ় গলায় বললো, 'আই লাভ ইউ, তারেক ভাই।'

তারেক ভেতরে ভেতরে কেঁপে যায়। ঝিলিক দিয়ে বুকের কোথাও বিদ্যুৎ খেলে যেন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিহরণের ঢেউ আছড়ায়। রূপার মুখে আচমকা এ রকম একটা কথা তারেক আশা করেনি।

– আমার জন্য আপনার কোনো ফীলিং হয় না? রূপা তারেকের দিকে ঘাড় ফেরালো।

তারেক কিছু না বলে তাকালো রূপার দিকে। দুই জোড়া চোখের ভেতর মানবজীবনের সবচেয়ে রক্তিম সংকেতের বিনিময় হয়ে গেলো। রূপা আবার চোখ রাখে সামনে। এদিকে যানবাহনের ভীড় ক্রমশ বাড়ছে।

তারেক বাঁ দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে একটা মেলা বসেছে যেন। আশুলিয়ার টলটলে পানিতে বিভিন্ন ধরনের অজস্র বাহারি নৌকা। সব কটিতে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী। বিলের পাড় ঘেঁষে সারি সারি বেঞ্চে বসা তরুণ-তরুণীর দল। কোথাও শুধু ছেলেরা দল বেঁধে বসে হৈচৈ করছে, কোথাও ফুচকার দোকান ঘিরে এক দল মেয়ে। যৌবনের বাঁধভাঙা উৎসব চলছে যেন। দৃশ্যটা দেখতে ভালো লাগে তারেকের। কিন্তু ভীড় এবং কোলাহল ও এতটা আশা করেনি। আজকাল নাকি এখানে ছিনতাই হয়। ড্রাগের আড্ডাও বসে নৌকায়। জায়গাটায় আসার ইচ্ছা ওর বহুদিনের। এখন আবার যোগ হয়েছে ফ্যান্টাসি কিংডম। ও জায়গাটা শিশু-কিশোর এবং বড়দের ভীড়ে গিজগিজ করছে।

– নাহ্ তারেক ভাই। এখানে ভাল্লাগবে না। তার চেয়ে সাভারের দিকে যাই। ওদিকে ভিড়বাট্টা নেই।

রূপার কথার উত্তরে তারেক বললো, 'রূপা, আমিও তাই ভাবছিলাম। এত ক্রাউড ভাল্লাগে না।'

– হ্যাঁ সাভারের দিকেই যাই। আমি বন্ধুদের নিয়ে আগে কয়েকবার গিয়েছি। কিছু সুন্দর স্পট আছে। বংশীর পাড়ে বসে থাকতে বেশ লাগে।

– বাহ্ নদীর নামও জানেন দেখছি! তারেক অবাক হলো।

– ও, তারেক ভাই। সাভারে ব্যাংক টাউনে আমার এক চাচা থাকে। আমি বহুবার এসেছি। সাভার আমার মোটামুটি চেনা।

– আর আমি ঠিক উল্টো। বার দুই এসেছিলাম। তাও শুধু স্মৃতিসৌধে। একবার ২৬শে মার্চে, একবার বিজয় দিবসে। তারেক বললো।

– ছোটবেলায় স্মৃতিসৌধে আমি একবার ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে আমার সে কি কান্না। রূপা শব্দ করে হাসলো।

– তারপর কি হলো?

– সে এক সিনেমা। আমি পড়লাম এক মহিলা ছেলেধরার খপ্পরে। বেটি আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবার নাম করে স্কুটারে প্রায় তুলে ফেলেছিলো, এমন সময় দূর থেকে আমার চাচাতো ভাই আমাকে দেখে ফেলে। ও ওর বন্ধুদের নিয়ে দৌড়ে এসে স্কুটার ঘিরে ফেলে। নইলে আজ যে আমি কোথায় থাকতাম!

– দারুণ বেঁচে গেছেন।

উত্তরে রূপা মুচকি হাসলো। আশুলিয়া বাঁয়ে ফেলে রূপার গাড়ি সাভারের দিকে ছুটে চলে। ওরা যতো সাভারের দিকে যায়, রাস্তা ততো ফাঁকা হয়ে আসে। সাঁই সাঁই করে দূরপাল্লার কোচ আসছে, যাচ্ছে।

ছোট নদী বংশী। কুলকুল বয়ে চলে প্রায় সারা বছর। বর্ষায় দুই পাড়ের ঢালু জায়গা পানিতে ভরে যাওয়ার ফলে বেশ চওড়া দেখায়। এ সময় মাঝে মাঝে বড় লঞ্চ যাওয়া-আসা করে। আর ট্রলার, ইঞ্জিনের নৌকা চলে সারা বছর। বংশীর একটা স্নিগ্ধ, শান্ত রূপ আছে। যখনই সাভার আসে, চাচাতো ভাই টুলুকে নিয়ে রূপা নদীর কিনার ধরে ইচ্ছেমতো হাঁটে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে নির্জন কোনো জায়গায় বসে দু'জন গল্প করে।

মাঝে মাঝে নদীতে বেদের বহর আসে। একসঙ্গে বিশ-ত্রিশটা নৌকা। বাজারের আশেপাশে ওগুলো কয়েক সপ্তাহ বা মাস-দু'মাসের জন্য ভেড়ে। সেজেগুঁজে বেদেনীরা সাপের ঝাঁপি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে যায়। গ্রামে সাপের খেলা দেখিয়ে, টোটকা ওষুধ বেচে যে ক'টাকা পায়, তা নিয়ে সন্ধ্যায় নৌকায় ফেরে। পুরুষরা আগে সাপের খেলা দেখাতো। এখন ওদের অনেকে বাজারে অথবা গেরস্ত বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করে। এতে পয়সা বেশি আসে। বেশ কয়েকটা পরিবার নৌকার জীবন ছেড়ে নদীর ধারে ডাঙায় বস্তির মতো ঘর তুলেছে। এদের বাচ্চারা স্কুলে পড়তে যায়, পুরুষরা রিক্সা চালায়।

নদীর ধারে একটা বড় আম গাছের নীচে বসে রূপা বেদে জীবন সম্পর্কে ওর যৎসামান্য যে ধারণা হয়েছে, সেসব বলছিলো তারেককে। মাত্র কয়েক গজ দূরে পাকা রাস্তা। রাস্তা থেকে সামান্য নামিয়ে রূপা গাড়ি পার্ক করে এসেছে। তারেক ওর প্রায় গা ঘেঁষে বসা। ঘন, সবুজ ঘাসে ছাওয়া জায়গাটা। এখন ঘাটে বেদের বহর নেই। তবে ওদের ছোট বস্তিটা দূরে দেখা যায়।

– জানেন তারেক ভাই, বেদেরা একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে। বাংলার মতো, অনেক বাংলা শব্দ আছে, কিন্তু হুবহু বাংলাও নয়।

তারেক মুগ্ধ চোখে তাকায় রূপার দিকে। সেদিন রাতে তিন্নিদের বাসার ছাদে উদ্দাম, লাস্যময়ী তরুণীটির সঙ্গে ও এই মুহূর্তের রূপাকে মেলাতে পারছে না। রূপা মোটেই অগভীর বা হালকা ধরনের মেয়ে নয়। জীবন ও মানুষকে জানার আগ্রহ আছে ওর, দেখার চোখও আছে। রূপার সৌন্দর্যের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিলে গেছে ওর মেধা।

–বেদেরা কী ভাষায় কথা বলে?

তারেক চমকে উঠলো। কী বলবে বুঝতে পারছে না। অনেক দিন আগে একটা বাংলা পত্রিকার সচিত্র ফিচারে পড়েছিলো, বেদে সমাজের আদি ভিটা আরাকানে। সুতরাং ওদের ভাষাও আরাকানী হবে, সঙ্গে বর্মী ভাষার মিশেল থাকতে পারে।

–আমি যতদূর জানি, ওদের ভাষা আরাকানী। খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তরটা দিতে পারলো না তারেক।

–নন্‌নাহ্। তা কি করে হয়? কোথায় আরাকান, চিটাগাং ছাড়িয়ে, বার্মার ভেতর। সেখান থেকে ওরা এদিকে আসবে কেন? তাছাড়া কর্ণফুলির সঙ্গে এদিককার নদীর লিংক আছে বলে শুনিনি। অবিশ্বাসী গলায় কথাগুলো বললো রূপা।

–আমি অনেক আগে পত্রিকায় একটা আর্টিকল্ পড়েছিলাম। ওখানে এ রকমই লেখা ছিলো কিন্তু।

–কী জানি, হলে হতেও পারে। এই যে জিপসিরা, সারা ইউরোপে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নেচে-গেয়ে মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে– ক'জন জানে ওদের আদি বাসস্থান ছিলো ইন্ডিয়া?

রূপার কথা শুনে বিস্ময়ে দু'পাশের চোয়াল ঝুলে পড়ার অবস্থা তারেকের। এ মেয়ে রীতিমতো জিনিয়াস। এ অসাধারণ। মোহগ্রস্তের মতো রূপার দিকে চেয়ে থাকে ও।

রূপা যেন লজ্জা পেলো। মুখে লালচে আভা। 'তারেক ভাই, এভাবে তাকিয়ে থাকবেন না। আমার লজ্জা করে।' রূপা দু'হাতে মুখ ঢাকলো।

–লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আপনি জিনিয়াস। আপনার মতো মেয়ে ঢাকায় ক'টা আছে? উচ্ছ্বাসে, আবেগে গাঢ় হয়ে আসে তারেকের কণ্ঠ।

রূপার দৃষ্টি নদীর দিকে। অনেক দূর দিয়ে একটা ছইঅলা মালের নৌকা যাচ্ছে। আগে এসব নৌকায় একটার ওপর একটা– এভাবে তিন-চারখানা পাল থাকতো। নৌকার পেছনে হাল ধরে বসে থাকতো প্রবীণ কোনো মাঝি। বাতাস না থাকলে নৌকার দু'পাশ থেকে তালে তালে দাঁড় ফেলতো আট কিংবা দশজন জোয়ান মাঝি। গুন টানা তো ছিলোই। দশ বছর আগেও নদীতে এ দৃশ্য দেখা গেছে। এখন পাল, দাঁড়, বৈঠা বা গুন– কোনোটাই নেই। নৌকা চলে ইঞ্জিনে। ঐ নৌকাটাকেও ঠেলে নিচ্ছে ইঞ্জিন। হালকা ভটভট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হাল ধরে অবশ্য একজন বসে আছে। নৌকাটায় ভারি কোনো মাল আছে। ডুবুডুবু অবস্থা। তারেক খেয়াল করে দেখলো, নদীতে যে ক'টা নৌকা চলছে, সবগুলোতে ইঞ্জিন বসানো। শুধু ওদের সামনে দিয়ে এক বালক বৈঠা চালিয়ে কোসা বেয়ে যাচ্ছে।

তারেক ঘনঘন কয়েকবার নিঃশ্বাস টানলো। আরে, সেই গন্ধটা! সেই অলৌকিক সুরভি, যার উৎস কোথায়, তারেক জানে না। নাকি আশেপাশে কোনো ফুলের ঝাড় আছে? তারেক ডাইনে, বাঁয়ে, পেছনে মাথা ঘুরিয়ে দেখলো। নাহ্, সেরকম কোনো গাছ চোখে পড়লো না। অনেক দূরে নদীর কূল ঘেঁষে কাশবন। ধবধবে সাদা কাশফুল। কাশফুলে গন্ধ নেই।

হঠাৎ অস্থির মনে হয় রূপাকে। কী যেন খুঁজছে মাথা ঘুরিয়ে। এক সময় ও দাঁড়িয়ে পড়লো।

–কী হলো রূপা?

রূপা তারেকের দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো, 'তারেক ভাই, আমার খুব আনন্দ করতে ইচ্ছে করছে। কী করবো বুঝতে পারছি না। উহ্, কী যে ভাল্লাগছে না!'

–হঠাৎ এত খুশি! তারেকের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে চায় না।

–কী জানি। এ রকম কখনো হয়নি। উহ্! রূপা দৌঁড়ে রাস্তার পাশে পার্ক করা ওর গাড়িতে হেলান দিয়ে

দাঁড়ায় কয়েক মুহূর্তের জন্য। অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর ছুটে আসে তারেকের কাছে।

–বসুন তো! তারেক কথাটি ধমকের সুরে বললো।

–বসুন নয়, বসো। আমাকে তুমি করে বলবেন এখন থেকে। কোমরে দু'হাত রেখে বললো রূপা। ও যেন আদেশ দিলো। আজ ওর পরনে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি, ব্লাউজ। উজ্জ্বল শ্যামলা কপালে নীল টিপ। পায়ে নীল স্ট্র্যাপের স্যান্ডেল। হাতে নীল ব্যান্ডের ঘড়ি। আকস্মিকভাবে মুখে লালের ছোপ লাগায় সাজসজ্জার নীল পটভূমিতে ওকে অপরূপ লাগে।

–তারেক ভাই, আমার গাছে উঠতে ইচ্ছে করছে। ওই যে একটা পাখির বাসা। রূপা আমগাছটার দিকে আঙুল তুললো।

–এ্যাঁ! গাছে উঠবে? মেয়েরা গাছে ওঠে নাকি? তারেক উঠে দাঁড়ালো।

–বাহ্, মেয়েরা বুঝি গাছে উঠে না? হাসতে হাসতে বললো রূপা।

–ওঠে। গেছো মেয়েরা ওঠে।

–আমি তো গেছো মেয়ে। আমাদের বাসায় পেয়ারা গাছে উঠে আমি, পেয়ারা পাড়ি। রূপা বললো।

কাঁদবে না হাসবে, তারেক বুঝতে পারছে না। ও কপাল কুঁচকে, কিন্তু মুখে হাসি রেখে বললো, 'রূপা, সে তো বাসা। এটা অচেনা জায়গা। মানুষ কী বলবে? তাছাড়া তোমার পরনে শাড়ি। শাড়ি পরে গাছে ওঠা যায়?'

–ওহ্ হো, তাইতো! কেন যে আজ শাড়ি পরলাম। সত্যি সত্যি নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ করেছে, এমন ভাব করলো রূপা।

–তাহলে আমিই বাসাটা পেড়ে আনছি। কিন্তু পাখির বাসা পাড়া কি ঠিক? ওরা কত কষ্ট করে একটা বাসা বানায়, ওখানে ডিম পাড়ে....।

–তাহলে থাক। রূপা দু'দণ্ড কিছু ভাবলো। সুরভিটা আরো তীব্র হয়েছে। গন্ধের উৎসটা যেন ঠিক এখানেই।

–রূপা তুমি কোনো গন্ধ পাচ্ছো? একটা মিষ্টি ঘ্রাণ? তারেক রূপার চোখে চোখে তাকালো।

রূপা জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, ফুলের গন্ধের মতো। কী ফুল? কী ফুল?'

–আমিও ধরতে পারছি না।

–নদীর ধারে হতে পারে। আচমকা রূপা নদীর দিকে ছুটে গেলো। এটার জন্য তারেক প্রস্তুত ছিলো না। কয়েক মুহূর্তের হতভম্ব অবস্থাটা কাটার পর সেও ছুটলো নদীর দিকে। মেয়েটা হঠাৎ পাগল হয়ে গেলো নাকি?

রূপা পাড়ে গিয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর চোখের পলকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেলো পাড় থেকে বেশ অনেক দূর। সোজাসুজি সাঁতরাতে পারছে না। কেবলই ডানে সরে যাচ্ছে। তার অর্থ নদীতে প্রবল স্রোত। বর্ষার ভরা নদী। যে কোনো মুহূর্তে ঘূর্ণির পাকে পড়ে যেতে পারে। তাহলে নির্ঘাৎ ডুবে মরবে। রূপা সাঁতরাতে সাঁতরাতে পেছন ফিরে হাসছে, ডাকছে তারেককে। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ! শাড়ি পরে কতক্ষণ সাঁতরানো যায়। এই বুঝি ডুবে গেলো রূপা।

তারেক দেরি না করে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু রূপার গতির সঙ্গে ও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তীব্র গতিতে ও দু'হাতে পানি কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। তারেক জোরে জোরে ওর নাম ধরে ডাকলো। রূপা ফিরে তাকাচ্ছে না। তারেক এবং ওর মাঝখানের দূরত্ব এখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাতের কম হবে না। তারেক প্রাণপণে সাঁতরাতে থাকে। এভাবে রূপাকে পানিতে ডুবে মরতে দেয়া যায় না। কী হলো ওর হঠাৎ, তারেকের মাথায় আসছে না। এক সময় রূপার গতি কমে এলো। তারেক বুঝতে পারলো, ও ক্লান্ত হয়ে

আসছে। এখন যদি ঘূর্ণির মাঝখানে পড়ে যায়, তাহলে ও তলিয়ে যাবে। তারেক প্রাণপণে সাঁতরাতে থাকে। রূপার কাছে পৌঁছুতে ওর বেশি সময় লাগলো না। যদিও খুব কষ্ট হচ্ছিলো। গ্যাবার্ডিনের ভারি প্যান্ট ও ফুলহাতা শার্ট ভিজে ভারি হয়ে গেছে। বুদ্ধি করে স্যান্ডেল সু-জোড়া খুলে পাড়ে রেখে এসেছে।

–তারেক ভাই, আমাকে বাঁচান। আমি ভেসে থাকতে পারছি না। রূপা চীৎকার করে বলতে চাইলো। কিন্তু ওর কণ্ঠ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

–রূপা, ভয় নেই। আমি এসে গেছি। তারেক মরিয়া হয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে রূপার একেবারে কাছে পৌঁছে গেলো। ডুবন্ত মানুষকে বাঁচাতে গেলে ওর চুল ধরতে হয়। হাত ধরা নাকি বিপজ্জনক। যে ডুবে যাচ্ছে সে দিশেহারা হয়ে অন্য হাত দিয়ে উদ্ধারকারীকে আঁকড়ে ধরে। ফলে দু'জনই ডোবে। তারেক রূপার চুল আঁকড়ে ধরা মাত্র ও নিজেকে ছেড়ে দেয়। এক সময় সম্পূর্ণ নিস্তেজও হয়ে পড়ে। বাঁ হাতে রূপার চুল আঁকড়ে ধরে এক হাতে তীরের দিকে সাঁতরায় তারেক। পাঁচ মিনিট না যেতেই ও হাঁপিয়ে পড়ে এবং এক সময়, যে ভয়টা পাচ্ছিলো, সেটাই ঘটলো। বেশিক্ষণ পানিতে থাকলে ওর পায়ের পাতায় খিল ধরে। এখনো তাই হলো। তীব্র ব্যথায় ওর মুখচোখ বিকৃত হয়ে গেছে। তবুও সাঁতরাতে থাকে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রূপা, 'তারেক ভাই, খুব কষ্ট হচ্ছে? আমরা এভাবে ডুবে মরবো?'

তারেক দু'দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না না। অসম্ভব।' ঠিক ঐ সময় আবার নাকে এসে লাগলো সৌরভটা। গন্ধটা এখন ওর চেনা হয়ে গেছে। এ কিসের ঘ্রাণ? তাহলে এনামুলের কথা সত্যি? ও বলছিলো, গন্ধটা ছড়ায় সেই পরীর গা থেকে, যার নজর পড়েছে ওর ওপর! এই মুহূর্তে নিজেকে অসহায় মনে হলো তারেকের। মাঝনদীতে ওকে আর অসহায় এক মেয়েকে পরীতে ধরেছে? কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটা ইঞ্জিন-বোট যাচ্ছিলো সামান্য দূর দিয়ে। ওদের এ অবস্থায় দেখে বোটের লোকজন হৈ চৈ করে ওঠে। তারেকও হাত তুলে সাহায্য চায়। দেখতে দেখতে বোটটা ওদের কাছে চলে এলো। লোকজন টেনে তুললো ওদের দু'জনকে।

রূপা প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো। ওরা পাড়ে এসে গাড়িটা এক দোকানদারের জিম্মায় রেখে ব্যাংক টাউনে রূপার চাচার বাসায় চলে আসে। ওদের কপাল ভালো। দোকানদার ভদ্রলোক রূপার চাচাকে চিনতে পেরেছিলো। রূপার চাচা এলাকার আদি বাসিন্দাদের একজন। তাছাড়া এখানকার সবচেয়ে বড় পোলট্রি ফার্মটা ওঁর। বাজারে এবং দোকানে দোকানে ওর মুরগি ও ডিম সাপ্লাই হয়। ঢাকাতেও যায়।

সে রাতটা রূপা বাসায় ফিরলো না। ফোনে জানিয়ে দিলো, সাভারে চাচার বাসায় আছে। তারেকের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে ওকেও থেকে যেতে বলেছিলেন রূপার চাচা, বাসার লোকজন। তারেক ভেবে দেখলো, সেটা খুব ভালো দেখাবে না। ও বাসে ঢাকা চলে এলো।

॥পাঁচ ॥

সাভারের ঘটনাটা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনে এনামুল বললো, ফুলকুমারী রূপার ওপর জেলাস হয়ে পড়েছে। ও রূপার ক্ষতি করতে চায়।

–ফুলকুমারী? সে আবার কে? হতভম্বের মতো প্রশ্ন করলো তারেক।

–সেই পরী, যে তোর ওপর ভর করেছে। নির্বিকারভাবে বললো এনামুল।

–বাহ্ বাহ্! জব্বর দেখালি দোস্ত। নাম পর্যন্ত বের করে ফেললি।। হাসতে থাকে তারেক।

–না তারেক। এটা তামাশা না। ডোন্ট লাফ। ওর নাম ফুলকুমারী। গম্ভীরভাবে এনামুল বললো।

–আরে, কী আজগুবি কথা। পরী বলে কিছু আছে কিনা সেটাই ঠিক হলো না, আর উনি বলছেন ওর নাম ফুলকুমারী। আর যদি তা-ই নাম হবে, সেটা জানবো আমি। তুই জানবি কীভাবে?

–তুই জানতে পারবি না। কারণ তুই তো ফুলকুমারীর অস্তিত্বই স্বীকার করিস না। কিন্তু আমি করি। আমি বিশ্বাস করি, ও আছে।

–ডিয়ার ফ্রেন্ড, ফুলকুমারী কিন্তু আমার আবিষ্কার। তারেক গলা ভারী করে বললো।

হো হো করে হেসে উঠলো এনামুল। হাসি থামিয়ে বললো, 'শালা, এখন হিংসা হচ্ছে, না? পরী হোক, আর মানুষ হোক, মেয়ে মানুষের ব্যাপারে ছাড়াছাড়ি নেই। নো কম্প্রোমাইজ। তাই না? এনামুল ফের হাসতে থাকে।

এনামুলের বাসায় সাততলার ব্যালকনিতে কথা হচ্ছিলো। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। হাসির শব্দ শুনে দীনা বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলো। ও আজ সন্ধ্যার আগেই ফিরেছে। গত সপ্তাহে ঠিক করা ছিলো, তারেক আজ এ বাসায় খাবে।

–কী ব্যাপার, হাসির কারণটা শুনি? দীনা তারেকের পাশে খালি চেয়ারটায় বসে পড়ে।

–তারেক আমার ওপর জেলাস হয়ে পড়েছে।

–কারণ? দীনা তারেকের দিকে তাকালো।

–ফুলকুমারী।

ফুলকুমারী কে?

-ঐ যে, সেই পরী। যে তারেকের ওপর ভর করেছে। এনামুল বললো।

–ওর নাম ফুলকুমারী নাকি? এসব নাম ছোট বেলায় রূপকথার বইয়ে পড়েছি। ডালিম কুমার, মেঘবতী, কুচবরণ কন্যা.... এ রকম আরো কত নাম। ওর নাম ফুলকুমারী তোমরা জানলে কিভাবে? তীব্র কৌতূহল উপচে পড়ছে দীনার চোখেমুখে।

–ভাবী, এটা এনামুলের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এসেছে। রাতে বোধ হয় জ্বর এসেছিলো। জ্বরের ঘোরে ও নামটা আবিষ্কার করেছে। হয়তো নরীকে দেখেও থাকতে পারে। তারেক বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো।

-কিন্তু তারেক ভাই, পরীটা তো আছে। নামের প্রসঙ্গ না হয় বাদ দিলাম। এই যে একটু আগে আপনি রূপা না কে, ওর পানিতে ডুবে যাওয়ার কথা বলছিলেন।

তারেক দু'দিকে অসহিষ্ণুভাবে মাথা নাড়িয়ে বললো, 'ভাবী, ওটা একটা এক্সিডেন্ট। এটা যে কোন মেয়ের জীবনে ঘটতে পারে।

-কিন্তু তোর ছাত্রীর খালা আচমকা অমন অদ্ভুত আচরণ শুরু করলো কেন বল? তুই বলছিস ঐ সময় তোর নাকে সেই মিষ্টি গন্ধটা এসে লাগে। আর মেয়েটা বললো গাছে উঠবে, তারপর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। না দোস্ত, এটা একটা এ্যাবনরমাল ব্যাপার। যুক্তি দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এনামুলকে চিন্তিত দেখায়।

–শোন্ এনামুল। রূপা অদ্ভুত টাইপের মেয়ে। খুব ট্যালেন্টেড, অনেক কিছু জানে। আবার ভীষণ চঞ্চল। কখন যে মাথায় কী খেয়াল চেপে বসবে, বলা মুশকিল। আমার তো মনে হয়, ঐ দিনের ব্যাপারটা জাস্ট ওর এক ধরনের পাগলামি।

দীনা কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো তারেকের দিকে। তারপর বললো, আমিও কিন্তু আপনার সঙ্গে এক হতে পারছি না। আমার মনে হয়, ঐ সময় পরীটা আপনাদের পাশে ছিলো। রূপার ওপর ও জেলাস হতেই পারে। পরী হলেও নারী তো।

হো হো করে হেসে উঠলো তারেক। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। হাসি যেন থামতে চায় না।

–ও মা। আমার মনে হয়, তোরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ মিলে গাঁজা খাওয়া শুরু করেছিস। এনামুল তো আগে খেতো জানি। কীরে, আবার ধরেছিস নাকি? তারেক এনামুলের দিকে তাকালো।

–তামাশা বাদ দিন তো, তারেক ভাই। দীনা বললো।

– আমি তামাশা করছি না। করছেন আপনারা দু'জন। যত্তোসব আজগুবি কথা।

এনামুল অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে ছিলো তারেকের দিকে। এবার মুখ খুললো, আচ্ছা তারেক, রূপার সঙ্গে পরে তুই ঘটনাটা নিয়ে কথা বলেছিলি? ওর কী ফিলিংস?'

– ওর বাসায় পরদিন ফোন করেছিলাম। বাসা থেকে ওর মা বললেন, ওর খুব জ্বর।

সঙ্গে সঙ্গে এনামুল বললো, 'এই তো মিলে যাচ্ছে। জ্বিন-পরীতে ধরলে মানুষের জ্বর হয়। আমার দাদী বলেন, এদের পাল্লায় পড়লে অনেকের কঠিন অসুখও হয়।'

–শোন বোকা। এটা সহজ হিসাব। রূপা অনেকক্ষণ পানিতে ছিলো। ওর ঠাণ্ডা লেগেছে। ঠাণ্ডা থেকে জ্বর। দু'জনের দিকে তাকিয়েই কথা ক'টি বললো তারেক।

–আচ্ছা, রূপার জ্বরটা ছাড় ক আগে। ওর মুখেই সব শোনা যাবে। হঠাৎ থামলো এনামুল। তারপর, 'জ্বর না-ও ছাড়তে পারে। ফুলকুমারী যদি হিংস্র স্বভাবের হয়, তাহলে চিন্তার কথা।'

–তুমি আবার বেশি বেশি। রাখো তো ফালতু কথা। জ্বর অবশ্যই ছাড়বে। ঠাণ্ডা লাগাই স্বাভাবিক। দীনা বললো।

–দেখলি এনামুল, ভাবী ঠিকই বুঝতে পেরেছে। আর তুই আছিস পরী নিয়ে। আসলে অসুখে ভুগে ভুগে তোর মাথার কলকব্জা বিগড়ে যাচ্ছে।

–আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তবে ফুলকুমারীর কাছে আমার পুরনো জ্বরটার জন্য ওষুধ চাইবো। এনামুল বললো।

–বাহ্, বাহ্। আর কী চাইবি? সোনা-রূপা, হীরা....? যাদুর বাঁশি? তারেক আবার হেসে উঠলো।

–চাইবো। আরেকটা জিনিষ চাইবো। এনামুল স্ত্রীর দিকে তাকালো। দীনা একটু লজ্জা পেলো যেন। ও উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলো।

–শুনি, কী? তারেক এনামুলের দিকে সামান্য ঝুঁকে গেলো।

–থাক এখন। আমার রূপার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। এনামুলের কপালে ভাঁজ পড়ে।

–ফোন করে দ্যাখ্। নাম্বার দিচ্ছি। তারেক পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক বের করে রূপার মোবাইলের নম্বর বললো।

–এ যে দেখছি মোবাইল। দীনার কাছে ফোন চাইতে হবে। আমি ওর মোবাইল ইউজ করি না।

–কোনো ঘটনা আছে নাকি? বউয়ের মোবাইল।

–ব্যাপার আছে। কিছু কিছু ব্যাপারে দীনা ভীষণ জটিল। ওর কাছে মোবাইল চাইলে দেয় ঠিকই। কিন্তু দু'তিন সেকেন্ডের জন্য হলেও মুখটা কালো করে। এটা আমি বুঝতে পারি। তুই বুঝতে পারবি না।

–মোবাইল আমাকেও দেবে না? তারেক গলা সামান্য চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো।

–ঐ যে বললাম, দেবে। কিন্তুর ওর কপালটা কুঁচকে যাবে কয়েক মুহূর্তের জন্য।

–স্ট্রেঞ্জ!

–থাক এ প্রসঙ্গ। মানুষের কত রকমের শর্টকামিংস থাকে। আমাদেরও আছে। দার্শনিকের মতো উদাস গলায় বললো এনামুল।

–শোন্ শোন্, রূপার মোবাইলে টিএন্ডটি থেকেও ঢোকা যায়। ও বলছিলো।

এনামুল নিঃশব্দে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, 'মোবাইল বন্ধ।'

–হয়তো জ্বর ছাড়েনি। তারেক বললো।

–ওদের টিএন্ডটির নাম্বার আছে?

–তুই রূপাকে নিয়ে পড়লি কেন? ওর জ্বর হয়েছে। তিনদিন না হয় সাতদিন পর ভালো হয়ে যাবে। তারেককে বিরক্ত মনে হয়।

–কিছুই বলা যায় না। তারেক তোর ব্রেনে সুপারন্যাচরাল ব্যাপারটা নাই। ঐ ফ্যাকাল্টিটা অফ। তুই অনেক কিছু বুঝতে পারিস না।

–তুই খুব পারিস। আসলে আমি ঠিকই বলেছি। অসুখে ভুগে ভুগে তোর মাথা...... তারেক কথা শেষ করতে পারে না। দীনা ব্যালকনিতে এসে ওর চেয়ারে বসতে বসতে বললো, 'না তরেক ভাই। ওর সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আমার মেলে না। কিন্তু আমি ফুলকুমারীর ব্যাপারটা বিশ্বাস করি। ও যা বলছে, ঠিক বলছে। পরীটা আপনাকে চায়। কিন্তু রূপা ওর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

–সুতরাং ওকে সরাতে হবে। একেবারে সিনেমার স্ক্রিপ্ট। যদি বলেন তো, এ রকম কাহিনীর ওপর আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দিই ভাবী। আমি টুকটাক স্ক্রিপ্ট লিখেছি আগে। এটা খুব ভালো পারবো। নিজেরে অভিজ্ঞতা থেকে লেখা হবে তো! বলুন ডিরেক্টর-প্রডিউসার পাওয়া যাবে কিনা। যদি সিনেমা সম্ভব না হয়, তবে টিভির জন্য প্যাকেজ ড্রামা বানানো যেতে পারে। ওরা তো ভালো টাকা দেয়। আমার ভীষণ টাকার দরকার ভাবী। ফুলকুমারীর কল্যাণে যদি কিছু টাকা কামানো যায়, তাহলে পরীতে বিশ্বাস করি। এক নাগাড়ে বলে গেলো তারেক।

– তারেক ভাই, তাই লিখুন। যদি ওটার অজুহাতে ফুলকুমারী আপনার কাছে আসতে পারে। দীনা বললো।

তারেক কিছু চিন্তা করে। দীনা এবং এনামুল ওর দিকে তাকিয়ে আছে। তারেক মনে মনে বলে, আমি এখন সেই গন্ধটা পাচ্ছি.... হ্যাঁ সেই মিষ্টি ঘ্রাণটা। এটা আমি অস্বীকার করি কীভাবে? এ রকম কোনো পারফিউমের গন্ধ আমি আগে পাইনি। তবে কি রূপার গা থেকে গন্ধটা এসেছিলো? এখন আসছে দীনার গা থেকে? হতে পারে, অচেনা পারফিউম। কিন্তু বিলের পানিতে ঘ্রাণটা কোথা থেকে এসেছিলো।

-আচ্ছা এনামুল, তুই তো মাঝে মাঝে গ্রামে যাস। বন্যার পানিতে কোনো লতা জাতীয় গাছ হয় নাকি, যাতে ফুল ফোটে? ফুল থেকে গন্ধ ছড়ায়?

এনামুলকে অন্যমনস্ক দেখালো। ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করছে হয়তো। ও বললো, আমি ওরকম কিছু দেখিনি। তবে থাকলে থাকতেও পারে। হঠাৎ গন্ধের প্রসঙ্গ কেন?

সঙ্গে সঙ্গে দীনা প্রশ্ন করলো, তারেক ভাই, আপনি কি এখন মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছেন? দীনা ঘন ঘন শ্বাস টানলো, 'কই, আমি তো পাচ্ছি না? তুমি পাচ্ছো নাকি?' এনামুলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো দীনা।

এনামুল শব্দ করে বার তিনের শ্বাস টানলো। বললো, নাহ্। কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।

–আমি পাচ্ছি। সেই শরীর-মন অবশ করা সৌরভ। অপার্থিব সৌরভ। এ গন্ধ পৃথিবীর নয়। ভিন্ন কোনো জগতের। তারেক বললো, কিন্তু মনে মনে। ও চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, চোখ দুটো বুজে আসছে।

– তারেক ভাই, শরীর খারাপ লাগছে? দীনা উঠে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে এনামুলও চেয়ার ছেড়ে তারেকের দিকে এগিয়ে এলো।

–তারেক, তারেক হঠাৎ কী হলো? এনামুল বললো উদ্বেগের সঙ্গে।

–শোনো আমার মনে হয় তারেক ভাই টায়ার্ড। ইস্, একদিনে কতগুলো টিউশানি করে। তুমি ওকে একটু ধরো। আমি গেস্টরুমের বিছানাটা ঠিক করে আসছি। দীনা মর্জিনাকে ডাকতে ডাকতে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলো।

ফুলকুমারী, এটা ভীষণ অন্যায়। রূপা কোনো দোষ করেনি। ও তোমার সম্পর্কে কিছু জানে না। জানলে আমাকে নিয়ে ওর কোনো ইন্টারেস্ট থাকতো না। ফুলকুমারী, তুমি ওর কোনো ক্ষতি কোরো না, প্লীজ...। বিড়বিড় করে বলছে তারেক। সব কথা বোঝা যায় না। কিন্তু এনামুল ওর মুখে ফুলকুমারী শব্দটা পরিষ্কার বুঝতে পারে। ও তারেকের কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে, 'তারেক, ফুলকুমারী এসেছে? তুই দেখতে পাচ্ছিস?'

তারেক কোনো উত্তর না দিয়ে একদিকে মাথা ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে এনামুল না ধরলে চেয়ারসুদ্ধ পড়ে যেতো।

–ঘুমিয়ে পড়েছে? দীনা ব্যালকনিতে এসে জিজ্ঞেস করলো। ওর সঙ্গে মর্জিনা।

–হ্যাঁ।

তিনজন ধরাধরি করে তারেককে গেস্টরুমে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকতে শুরু করে দিলো তারেক। আঁচল মুখে চাপা দিয়ে হাসতে থাকে দীনা। মর্জিনা হাসতে শুরু করলে এনামুল ওর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকায়।

॥ছয় ॥

বন্যার পানি নেমে গেছে। কাদা সব জায়গায় সমানভাবে শুকায়নি। তারেকের জানালা দিয়ে বাতাসের সঙ্গে ঝলক ঝলক পাঁকের গন্ধ আসে। ক'দিন ধরে প্রচণ্ড রোদ। মকবুল সাহেবের বাড়িটা উঁচু জায়গায়। এখানকার পানি নেমেছে সবার আগে। এখন শুকনো খটখটে। তারেকের ঘরের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধটা কিছুতেই যাচ্ছে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে ও ঘরের এখানে ওখানে বেশ ক'টা মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখে। রাতেও কয়েল জ্বালে না, হাঁসফাঁস লাগে। ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত যতক্ষণ কয়েলগুলো জ্বলে, বাজে গন্ধটা টের পাওয়া যায় না। ও বেরিয়ে যাবার পরেও নিশ্চয় অনেকক্ষণ কয়েলের গন্ধে ঘরটা ভরে থাকে। ফিরে আসার পর কয়েলের হালকা ঘ্রাণ ছাপিয়ে ছাতা-পড়া গন্ধটা নাকে এসে লাগে। সব কয়েল একটানা জ্বলে না। মাঝখানে নিভে যায়।

প্রতি শুক্রবার তারেক খুব সকালে হেঁটে গিয়ে পাশের বাজার থেকে একটা বাংলা পত্রিকা কিনে আনে। সময় নিয়ে রেস্তোরাঁয় নাশতা খায়। পত্রিকা কেনা ওর এক ধরনের বিলাসিতা। ছুটির দিন বাড়তি পৃষ্ঠা থাকে, কাগজের দাম দশ টাকা। সপ্তাহে একদিন পত্রিকা কেনার ফলে ওর মাসে চল্লিশ টাকা বেরিয়ে যায়। কোনো মাসে পাঁচটা শুক্রবার পড়ে যায়। তখন পঞ্চাশ টাকার ধাক্কা। যাক কিছু টাকা। ছুটির দিনের প্রায় পুরোটা ও তারিয়ে তারিয়ে পত্রিকা পড়তে পারে। দিনের বেলা পড়ে শুধু খবর, উপ-সম্পাদকীয়, মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় ইত্যাদি।

অল্প সময়ের জন্য বাইরে যায়। দুপুরে খাবার আসে মকবুল সাহেবের বাসা থেকে। সন্ধ্যায় ফিরে ও পড়ে ফিচার, সাহিত্য পাতার গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। বন্ধের দিন ও মাত্র একটা টিউশানি করে। কোনো কোনো সপ্তাহে সেটাও বাদ দিতে চেষ্টা করে। আর কত ছাত্র পড়ানো। শরীরে কুলায় না।

পত্রিকা কিনে তারেক মাত্র ঘরে ফিরেছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর আজই ও প্রথম পত্রিকা আনলো বাজার থেকে। এক মাস এটা বন্ধ ছিলো। তখন শুক্রবার সকালেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো। ফিরতো সন্ধ্যার পর। বাজারে যাবার সময় কয়েল জ্বালানো ছিলো। গন্ধে ভুরভুর করছে ঘর। দরজায় মৃদু টোকা। তারেক পত্রিকা থেকে মুখ তুলে দেখলো, শিউলি। কালোর ওপর সোনালী কাজ করা কামিজ ও সালোয়ার পরা। মকবুল হোসেনের বড় মেয়ে। ক্লাস নাইনে উঠলো এবার। ছোট বোন পপি পড়ে সেভেনে। দু'জনের চেহারায় এত মিল, দেখলে মনে হয় যমজ বোন। গলার স্বরও এক। দুই মেয়েকে নিয়ে মকবুল সাহেবের চিন্তার শেষ নেই। অচেনা জায়গায় জমি কিনে ঘর তুলেছেন। আশপাশে বাড়িঘর তেমন ওঠেনি, ফলে প্রতিবেশীও নেই। তার সারাক্ষণ ভয় ভয় লাগে। কখন না এলাকার মাস্তানদের চোখ পড়ে মা-মরা মেয়ে দুটোর ওপর। তাঁর ছেলে দুটো গোবেচারা ধরনের, রেগোটে চেহারা। তারেক বোঝে, ওকে ভদ্রলোক এমনি এমনি ভাড়া দেননি। ওর সুঠাম শরীর। ওকে দেখে যদি মাস্তানরা দূরে থাকে। তারেকের অবশ্য সে রকম বখাটে ছেলেছোকরা এদিকে চোখে পড়েনি। এলাকাটায় এখনো গ্রামের পরিবেশ রয়ে গেছে। নগরজীবনের অনেক ক্লেদ ও নোংরামি থেকে এখনো বেশ মুক্ত। তবে এ অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। দশ বছর পর দালানের গায়ে দালান ওঠে, অসংখ্য সরু রাস্তা ও গলিতে লেগে থাকা রিকশা এবং গাড়ির জ্যাম, দোকানে আর বাজারে জায়গাটা থাকার অযোগ্য হয়ে উঠবে। রামপুরার পুবদিকে ওর এক মামাতো বোনের বাসা। সাত-আট বছর আগে ওদিকে গেলে ওর ফিরে আসতে ইচ্ছে করতো না। এমন খোলামেলা ছিলো জায়গাটা। এখন ওখানে যাওয়ার কথা মনে হলে দম বন্ধ হয়ে আসে। বাড়ির সঙ্গে বাড়ি, রাস্তায় রিক্সার জঙ্গল, চারদিকে ছড়ানো বস্তি। কোনো জায়গা ফাঁকা নেই।

–যাই তাহলে। ঘরে যখন ঢুকতেই বলবেন না। শিউলি যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়ায়।

তারেক তটস্ত হয়ে উঠলো। ও উঠে গিয়ে শিউলির এক হাত চেপে ধরে বললো, 'সরি। আসো।'

শিউলি ঘরের ভেতর এসে প্লাস্টিকের চেয়ারটায় বসে বললো, 'আচ্ছা তারেক ভাই, মাঝে মাঝে আপনার কী হয় বলুন তো?

– কী হয়? ঢোঁক গিললো তারেক।

– এই যে, কোথায় যেন হারিয়ে যান। 'মনে হয় আপনি যেন এ জগতে নেই। ওড়নায় নাক-মুখ ঢেকে শিউলি বললো। ওর গলায় অবশ্য ঝাঁজ নেই।

– কই না তো?

– সেটা আপনি বুঝবেন না। বাইরের মানুষ বুঝতে পারে।

তারেক লজ্জা পেলো।

– ভালো বুদ্ধি বের করেছেন তো? ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে শিউলি বললো।

– কী করবো বলো। বাজে গন্ধ। টেকা যায় না।

– হ্যাঁ এক মাসের বদ্ধ পানি। কিন্তু কয়েলের গন্ধ কতক্ষণ সহ্য করা যায়? আমার মাথা ঘুরায়। শিউলি বললো।

– তাহলে এখন নিভিয়ে দিই। তারেক উঠে দাঁড়ালো।

– না না। থাক। আমি যাই। ভাত কখন দেবো?

– মাত্র দশটা বাজে। দুটোর আগে খাবো না। আজ নাশ্‌তা হেভি হয়ে গেছে।

– হোটেলে কী নাশ্‌তা খান? সাগ্রহে প্রশ্ন করলো শিউলি।

– এই ধরো পরোটা-ভাজি। ডিম পোচ বা মামলেট। কোনোদিন নানরুটি মাংস বা গরম তেহারি।

– ইস্, আমার খেতে খুব ইচ্ছা করছে। রোজ নিজে নাশ্‌তা বানাই। সেই সাদা আটার রুটি আর হালুয়া।

– আচ্ছা, আগামী শুক্রবার আমি তোমাদের বাসার সবাইকে নাশ্‌তা খাওয়াবো। তারেক বললো।

– না না, তারেক ভাই। এটা বাড়াবাড়ি। আর আব্বা যদি জানে আমি নাশ্‌তা খেতে চেয়েছি ...

– তোমার আব্বা জানবে না। আর আমি কি তোমাদের একদিন নাশ্‌তার দাওয়াত দিতে পারি না? কথা ক'টি বলে তারেক জোরে হেসে ওঠে।

– হাসছেন যে?

– না, ঐ যে নাশ্‌তার দাওয়াত! লোকে খাওয়ায় চাইনিজ, আমি খাওয়াবো পরোটা-ভাজি। হাঃ হাঃ হাঃ।

– থামুন তো তারেক ভাই। এ রকম করলে আপনার নাশ্‌তা কিন্তু খাবো না।

– আচ্ছা ঠিক আছে। তারেক উঠে গিয়ে কয়েলগুলো নিভিয়ে দিলো। শিউলি কিছু বললো না।

– আচ্ছা, আমাদের বাসায় কিন্তু বাজে গন্ধটা অত তীব্র না।

– তোমাদের বাসার দরজা-জানালা আমার ঘরের মতো সারাদিন আটকানো থাকে না।

– কিন্তু তারেক ভাই, আমি তো মাঝে মাঝে আপনার ঘর খুলে ... শিউলি থেমে যায়।

– তাই নাকি! আকাশ থেকে পড়ে যেন তারেক।

অত্যন্ত লজ্জা ও জড়তার সঙ্গে শিউলি বললো, 'তারেক ভাই, আমি মাঝে মাঝে আপনার ঘর খুলে পরিষ্কার করে দিয়ে যাই। আপনি বুঝতে পারেন না?'

তারেকের সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। তাহলে ও যখন না থাকে, ওর ঘরে শিউলি আসে। ঐ রাতের ফুলের তোড়াটা কি ও-ই দিনের বেলা বিছানায় রেখে গিয়েছিলো? কিন্তু শিউলি এতটা এগুবে বলে মনে হয় না। তারেক গড়পড়তা পুরুষের চেয়ে দেখতে হ্যান্ডসাম, গায়ের রঙ একটু ময়লা হলেও চেহারা নায়কের মতো। ওর প্রতি তরুণী, এমন কি মাঝবয়সী মহিলাদেরও আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু শিউলি একেবারেই বাচ্চা মেয়ে। এটা ঠিক, এ বয়সে মেয়েরা রঙিন স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, বাইরের পুরুষদের যখন-তখন চোখে এবং মনে ধরে যায়, যুক্তি ছাপিয়ে আবেগ উপচে পড়ে। কোনো কোনো মেয়ে একজন পুরুষ বা সমবয়সী কাউকে নিয়ে দূরের অচেনা জগতে ভেসে বেড়ায়। চারপাশের বাস্তবতা অর্থহীন হয়ে পড়ে, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন হয়ে যায় কেউ কেউ। এ রকম একটা কিছু শিউলিকে নিয়ে সন্দেহ করেছিলো তারেক। কিন্তু এ কিশোরীর সঙ্গে ওর বয়সের পার্থক্য কুড়ি-পঁচিশের কম হবে না। কিশোরী মেয়েদের কি বয়স নির্বিশেষে সব পুরুষ সমানভাবে টানে? হয়তো বা। এ তো বিপদের কথা। এক অলীক ভুবনের নারী ফুলকুমারী ওর জীবন এলোমেলো করে দিচ্ছে এক মাসের বেশি হয়ে গেলো, এর মধ্যে ঢুকে গেলো রূপা। এখন শিউলি যদি ওকে নিয়ে অন্যরকম ভাবতে শুরু করে, তাহলে ওকে ঢাকা ছেড়ে গ্রামের বাড়ি গিয়ে থাকতে হবে। কিন্তু সেখানে খাবে কি? ওর বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয় যে, ওৎ নদীর ধারে গাছতলায় বাঁশি বাজিয়ে জীবন কাটাতে পারবে।

অজান্তেই তারেক এতক্ষণ শিউলির দিকে তাকিয়ে ছিলো। শিউলির বোধহয় সেটা মন্দ লাগছিলো না। হঠাৎ ও ওঠার ভঙ্গি করে বলে উঠলো, 'আমি যাই তারেক ভাই।'

তারেক বললো, 'আরে বসো বসো।'

শিউলি মাথা নীচু করে বসে রইলো।

–থ্যাংক ইউ শিউলি। উচ্ছল গলায় বললো তারেক।

– কেন তারেক ভাই?

– তুমি রেগুলার আমার ঘরটা পরিষ্কার করে দাও, সে জন্য। আমি একটা উজবুক। কিছু বুঝতে পারি না।

– না, তাতে কী। আপনার ঘরে তেমন ময়লা জমে না। শুধু বন্যার সময় আমি এসে জানালা খুলে দিতাম, যাতে বাজে গন্ধটা বেরিয়ে যায়, আর ঘরে কিছু আলো আসে। নইলে এতদিনে আপনার আলনার সব কাপড়ে ছাতা পড়ে যেতো। শিউলি কথাগুলো বললো অন্যদিকে তাকিয়ে। ওর ওপর এখন দুনিয়ার লজ্জা এবং সংকোচ ভর করেছে।

– শিউলি এদিকে তাকাও। তোমাদের বাসায় আমার তালার এক্সট্রা চাবি আছে?

– হ্যাঁ তারেক ভাই। সে তো শুরু থেকেই। তালাটা তো আব্বা আপনাকে দিলো। আপনার তো একটা ঝাঁটাও ছিলো না। জিভ কাটলো শিউলি।

– ও, তাইতো। আমার আর তালা কেনা হবে না।

– তালা কিনবেন কেন? ও তালায় সমস্যা হচ্ছে? এক্সট্রা চাবি আমার কাছে থাকে। নাকি আপনি চান না, আমি আপনার ঘর গুছিরে যাই? কিশোরীর কণ্ঠে ঝাঁজের আভাস।

– না না, শিউলি। আমাকে ভুল বুঝবে না, প্লিজ। তুমি এত সেন্টিমেন্টাল? এখন থেকে ঘর খোলাই থাকবে। নো তালা বিজনেস। তারেক বিছানা থেকে নেমে এসে শিউলির মাথায় হাত রাখলো। ঐ মুহূর্তে ওর ভেতর কী অনুভূতি হচ্ছিলো, ও বুঝতে পারে না। শিউলির সঙ্গে ওর শরীরের স্পর্শ শুধুই কি স্নেহের, ওতে কি সামান্যও রোমান্স মেশানো নেই? তারেক বুঝতে পারে, শিউলি বারবার শিউরে উঠছে, নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। চারদিক নিঝুম। শিউলিদের বাসায় কোনো সাড়াশব্দ নেই। মকবুল সাহেব বাজারে গেছেন। দুই ছেলে সকালে বেরিয়ে গেছে। বাসায় আছে কাজের বুয়া আর পপি। তারেক বুঝতে পারলো, ওর গরম লাগছে।

শিউলি লাফ দিয়ে ওঠে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর লাল ছোপ লাগা মুখটা ওড়নায় ঢেকে বললো 'এখন আমি যাই।' ও দরজার বাইরে চলে এসেছে।

তারেক ঘর থেকে গলা সামান্য চড়িয়ে বললো, 'ক'দিন আগে আমার বিছানায় তুমি ফুল রেখে গিয়েছিলে?'

এক মুহূর্তের জন্য তারেকের চোখে চোখ রেখে শিউলি দ্রুত বাসার দিকে চলে গেলো।

তারেকের সন্দেহ থাকে না, ফুলের তোড়াটা ওর বিছানায় শিউলি রেখে গিয়েছিলো। কিন্তু সে রাতেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সুরেলা কণ্ঠে ওর নাম ধরে ডেকেছিলো কে? বাইরে থৈ থৈ বন্যার পানি, রাত প্রায় বারোটা। শিউলির একা বাইরে আসার প্রশ্নই ওঠে না।

তারেক ঘরে ফিরে চেয়ারে ঝিম ধরে বসে রইলো।

॥সাত ॥

নবাবগঞ্জের যে ছাত্রটাকে তারেক পড়াতো, সে এসএসসি পাস করেছে। কোনো রকমে উৎরে গেছে আর কী। ওতেই ওর বাবা আনন্দে গদগদ। প্রায় প্রতিদিন বাসায় ভোজ দিয়ে যাচ্ছেন। আর লেখাপড়ার দরকার নেই। ছেলেকে এখন রোজ সঙ্গে করে চকবাজারের আড়তে নিয়ে যাবেন, ব্যবসার খুঁটিনাটি শেখাবেন ওকে হাতে-কলমে।

ছেলেটা পাস করায় তারেকও খুশি। ওকে পাস করানো ওর জন্য একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওকে দুশ্চিন্তাও পেয়ে বসে। একটা টিউশানি চলে গেলো। ও সবচেয়ে বেশি টাকা পেতো এ বাসায়।

তিন্নি দারুণ রেজাল্ট করেছে। এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তারেকের আশঙ্কা ছিলো, ও ফেল করবে। সেখানে ওর রেজাল্ট জিপি ফোর। তিন্নির বাসায় আনন্দের বন্যা বইছে। বাসায় যেতেই তিন্নি তারেকের হাত ধরে নিয়ে

গেলো বাড়ির ভেতর, ওর অসুস্থ মায়ের রুমে। ভদ্র মহিলা বিছানার সঙ্গে মিশে শুয়েছিলেন। তারেক কাছে যেতে তাঁর চোখের কোনা বেয়ে পানি পড়তে লাগলো। কিন্তু তাঁর শীর্ণ মুখে হাসির আভা। তিন্নি একটা মোড়া এনে রাখলো মায়ের মাথার কাছে। তারেক মোড়ায় বসে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলো। তিন্নির মা শোনা যায় না, প্রায় এ রকম গলায় তারেককে প্রাণভরে ধন্যবাদ জানালেন। বললেন, তারেকের কাছে ওর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তারেক যেন তিন্নি কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও পড়ায়। তারেক বললো, ও তিন্নিকে পড়াবে।

তিন্নির বড়খালা মিষ্টি আনতে গিয়েছিলেন। তিনি বাসায় ফিরে তারেককে দেখতে পেয়ে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে তুললেন। তারেকের মনে হলো, ও ছোট ছেলে হলে মহিলা ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেতেন।

আজ তিন্নির বাসার ছাদে সেদিনের চেয়ে বড় পার্টি। তিন্নির বাবা এখন সিঙ্গাপুরে। তিন্নি বারবার বাবার কথা বলছিলো। ও এবার একটা কার চাইবে। ড্রাইভিং শিখে নিজে গাড়ি চালাবে। আজ ওর পরনে শাড়ি। গেস্টরা আসতে শুরু করেছে। তিন্নি তারেকের হাত ধরে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে গেলো ছাদে। তিন্নির ক্লাসমেট, সমবয়সী ও বয়সে বড় বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের ভিড়ে ছাদ গমগম করছে। তারেকের ওখানে এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না। রূপা বাসায় শুয়ে জ্বরে কাতরাচ্ছে। গতবার রূপার আকর্ষণে ও অনেক রাত পর্যন্ত এখানে ছিলো। আজ ওর কাছে ছাদটা মরুভূমির মতো লাগে। তারেক ঠিক করলো, কালই রূপার বাসায় যাবে। তিন দিন ফোন করার পর রূপাকে একদিন পেয়েছিলো। দুই মিনিট কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছিলো। বলছিলো, কথা বলতে গেলে মাথা ঘোরে। নিজ থেকেই ফোন রেখে দিয়েছিলো।

রাস্তায় নেমে তারেক মত পাল্টালো। রূপার বাসায় ও আজই যাবে। ওকে দেখার জন্য বুকটা হু হু করে উঠছে। কেন ও সেদিন হঠাৎ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, সেটা ওর মুখ থেকে এখনো শোনা হয়নি। আজ শুনতে চাইবে না, শুধু রূপাকে দেখে আসবে।

রূপার বাসার ঠিকানাটা তারেক পকেট থেকে বের করলো। গুলশান দুই নম্বর চক্করের পুবে ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়ি ছাড়িয়ে চন্দ্রিমা অ্যাপার্টমেন্টের পাশে। রূপার বাবা নামকরা হার্টের ডাক্তার। সবাই এক নামে চেনে। ফার্মগেটে এসে তারেক গুলশানের বাস ধরলো। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে, বাসে ভীড় নেই। রাস্তায় জ্যামও কম। সাঁ সাঁ করে মিনিবাসটা ছুটেছে। কিন্তু ওর কপাল মন্দ। মহাখালীর একটু আগে শাহীন স্কুলের কাছে বাসটার ধাক্কা খেয়ে একটা অটোরিক্সা উল্টে গেলো। পাশ দিয়ে মোটর সাইকেলে যাচ্ছিলো এক ট্রাফিক সার্জেন্ট। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে। মিনিবাসের পথ আটকানো হলো। ফুটপাত এবং আশপাশ থেকে লোকজন ছুটে এলো। মুহূর্তে একটা জটলা পাকিয়ে গেলো রাস্তার মাঝখানে। সবাই চীৎকার করছে। অটোরিক্সাটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যাত্রী ছিলো এক তরুণ দম্পতি এবং ওদের ছোট একটা বাচ্চা। বেবির ভেতর থেকে ওদের টেনে বের করার পর দেখা গেলো বড় ধরনের আঘাত পায়নি কেউ। তবে মহিলার মাথার এক পাশ কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছিলো। স্বামীটা রক্তশূন্য মুখে বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চীৎকার করছে বাচ্চাটা। ড্রাইভারটার বুকে লেগেছে বোধ হয়। ও বুক চেপে কঁকাচ্ছে। দেখতে দেখতে এ্যাম্বুলেন্স এসে গেলো। সবাই তখন বলাবলি করছে, মিনিবাসের ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, হেলপার গেলো কোথায়। ওরা যেন ভোজবাজির মতো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। তারেক অনেক অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনেছে, কাগজে পড়েছে। কখনো দেখার অভিজ্ঞতা হয়নি। আর আজ একেবারে অ্যাক্সিডেন্টের মাঝখানে। আরো কিছুক্ষণ ওখানে থেকে ও মহাখালীর দিকে হাঁটা দিলো।

মহাখালী থেকেও গুলশানের বাস যায়। এবার মিনিবাস নয়, তারেক একটা বড় বাসে উঠলো। এটা অনেক নিরাপদ। বাসে উঠেই তারেকের মনে হলো প্যান্টের হিপ পকেটটা হালকা লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে ও পেছনে হাত দিলো। বুক ছ্যাঁৎ করে উঠলো ওর। মানিব্যাগটা নেই। অথচ মিনিবাসে ওটা বের করে ও ভাড়া দিয়েছে এবং বরাবরের মতো সাবধানে পকেটে রেখেছে ফের। নির্ঘাৎ অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটায় ভিড়ের মধ্যে পকেটমার ওটা তুলে নিয়েছে। তারেক ঘামতে থাকে। বড় বাস বলে রক্ষা। কন্ডাক্টর সামনের দিকে টিকিট কাটছে। ও বসেছে পেছন দিকে। বাসে মাত্র একজন কন্ডাক্টর। মনেপ্রাণে ও আল্লাহ্‌কে ডাকতে থাকে। দেখতে দেখতে বাস বনানী চেয়ারম্যান বাড়ি স্টপেজে এসে গেলো। বেশ ক'জন যাত্রী নামলো। ওদের ভেতর সেও টুক করে

নেমে পড়লো বাস থেকে। নেমে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না। দ্রুত রাস্তা পার হয়ে সোজা হাঁটতে থাকলো মহাখালীর দিকে। মেজাজটা তেতো হয়ে গেছে। মানিব্যাগে দুটো একশ' টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা ছিলো। অন্য দিন হলে ওর টাকার জন্য বুকটা জ্বলতো। এখন খারাপ লাগছে অন্য কারণে।

রূপাকে দেখতে যাওয়া হলো না। হাঁটতে হাঁটতে তারেক মহাখালী পেরিয়ে এলো। ও ঠিক করলো হেঁটেই মগবাজার, খিলগাঁও হয়ে বাসায় ফিরবে। এছাড়া উপায়ই বা কী। নাবিস্কোর কাছে আসার পর তারেক নাকে একটা গন্ধ পেলো। সেই মিষ্টি ঘ্রাণটা। পাশ দিয়ে একটা রিক্সা গেলো। খিলখিল করে হাসছে এক তরুণী।

তিন্নি এবং ওর মা যদিও বলছিলো তারেক তিন্নিকে কলেজে ভর্তি হওয়ার পরও পড়াবে, সেটা বোধ হয় হচ্ছে না। তিন্নি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর ওর পড়াশোনার দৈনন্দিন চাপটা কমে গেলো। কলেজে পড়াশোনার ধরন স্কুলের মতো নয়। তারেকের পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। কিন্তু তিন্নি বললো, ও তারেকের কাছে পড়বে। ওর বড়খালাও আরো দুটো বছর তিন্নিকে পড়াবার জন্য চাপাচাপি করলেন। তাঁর যুক্তি, তিন্নি আর্টস-এ ভর্তি হয়েছে। শুধু অংক ছাড়া সব বিষয় মোটামুটি আগের মতো আছে। বিশেষ করে কলেজের ইংরেজি যথেষ্ট কঠিন। তারেকের সাহায্য ছাড়া তিন্নি ইংরেজি নিয়ে সমস্যায় পড়বে। তারেক অবশ্য মন থেকে সায় পায় না। ও ঠিক করলো, এখন থেকে সপ্তাহে একদিন তিন্নিকে পড়াবে। আগে তারেক ও বাসায় যেতো সপ্তাহে তিন দিন। মাস তিনেক গেলে বোঝা যাবে, ওকে তিন্নির প্রয়োজন আছে কিনা। তবে এ সময়টায় ও কীভাবে আগের টাকা আশা করবে? ওরা হয়তো কমাবে না, কিন্তু সপ্তাহে মাত্র একদিন পড়িয়ে আগের টাকা নিতে ওর সংকোচ হবে। তারেক কী করবে বুঝতে পারছে না। চোখে অন্ধকার দেখছে।

ওর যথেষ্ট অবসর। সময় কাটতে চায় না। যোগাযোগ না রাখার ফলে অনেক বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। কীভাবে যেন এনামুল এখনো জড়িয়ে রয়েছে ওর জীবনে। এটা অবশ্য এনামুলের জন্য। ওর মতো মানুষ এই চরম আত্মকেন্দ্রিকতার দিনে বিরল। চারদিকে সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আখের গোছাচ্ছে সবাই। এনামুলের সেদিকে মন নেই। অথচ ও জীবনে অনেক কিছু করতে পারতো। ভালো ছবি আঁকে, গান গায়, লেখার হাত আছে। ওকে বসিয়ে দিলো কঠিন অসুখটা। বছরে দু'তিনবার প্রচণ্ড জ্বর। কেন ওটা হয় ডাক্তাররা সঠিক বলতে পারে না। এনামুলও ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে, আত্মবিশ্বাস কমে যাচ্ছে। জীবনটাকে ভালোবাসার মতো মনটাও ওর আগের মতো নেই। তার ওপর দীনা মাঝে মাঝেই বেশ বেপরোয়া এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন রোজকার খিটিমিটি থেকে কলহ চরমে ওঠে। এর কিছুদিন পর দীনা থাকে বাধ্য, শান্ত গৃহবধূ। ওই সময়টায় এনামুলকে প্রফুল্ল আর ঝলমলে দেখায়। তারেক বুঝতে পারে, সংসারে সন্তান না থাকার জন্য মূলত এটা হচ্ছে। দীনাকে ও দোষ দেয় না। এক ধরনের শূন্যতাবোধ থেকে বোধ হয় মাঝে মাঝে ওর মাথা বিগড়ে যায়।

এনামুলের জ্বর নেই এখন। ওকে অফিসে পাওয়া গেলো। তারেককে দেখে ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ও যেন তারেকের অপেক্ষাতেই বসে ছিলো। ও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চল। অনেক কাজ হয়েছে।'

–কোথায় যাবো? একটু বসবো না? তারেক অবাক হয়ে বললো।

–বাইরে গিয়ে বসবো। চল চল, অনেক কাজ হয়েছে। নীচু গলায় বললো এনামুল।

ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। রোদে ঝলসে যাচ্ছে চারদিক। রাস্তায় যানবাহন কম।

–এ রোদে কোথায় যাবি? তারেক বললো।

উত্তর না দিয়ে কিছু ভাবলো এনামুল। তারপর বললো, 'চল রমনা পার্কে যাই। লেকের পাড়ে গাছের নীচে বসবো।'

মন্দ নয় আইডিয়াটা। এ সময় পার্ক নির্জন থাকে। ইতি-উতি ঘুরে বেড়ায় ভবঘুরে, কান সাফাইঅলা, ছিঁচকে হাইজ্যাকার বা স্কুল পালানো ছেলের দল। দু'জন রিকশা করে পার্কে চলে এলো বিশ মিনিটের মধ্যে। হাঁটতে

হাঁটতে গিয়ে বসলো রমনা বটমূলের বেদী থেকে কয়েক হাত দূরে পাকা বেঞ্চে। জায়গাটায় ঘনছায়া। নীচে সবুজ ঘাস।

–একটা টিউশনি চলে গেলো, আরেকটা অনিশ্চিত। কী যে হবে! দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো তারেক।

–তুই ভেঙে পড়ছিস কেন? সিগারেট ধরিয়ে এনামুল বললো।

–আমার চলবে কী করে বল?

–আচ্ছা, তুই সেদিন আমার বাসায় বলছিলি, তোর নাটক-সিনেমার স্ক্রিপ্ট লেখার অভ্যাস আছে। ট্রাই করে দেখবি?

আগ্রহভরা দৃষ্টিতে তারেকের দিকে তাকায় এনামুল।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে তারেক বললো, ‘আমিও তাই ভাবছিলাম। কিন্তু মাঝখানে বিরাট গ্যাপ গেছে। আগের মতো হাত খুলে লিখতে পারবো?

–অবশ্যই পারবি। প্লট ক্যারেক্টার সব রেডি আছে। খালি ডেভেলপ করতে হবে।

তারেক বেঞ্চে রাখা এনামুলের প্যাকেট থেকে নিয়ে সিগারেট ধরায়। মুখ ভর্তি ধোঁয়া ছাড়ে কয়েকবার।

–তুই রাজি না থাকিস, তাহলে আমি লিখি। দ্যাখ কী জম্পেশ একখানা সিরিয়াল নামিয়ে দিই। নাম অবশ্য তোর যাবে। টাকাও তুই-ই পাবি।

তারেক সঙ্গে সঙ্গে বললো, ‘থ্যাংকস দোস্ত। আমি আজই বসছি। নাম দেবো ‘ফুলকুমারী’। টিভির জন্য সিরিয়াল।

–এই তো হয়ে গেলো। ঝটপট লিখে ফ্যাল। ওটার প্রচারের ব্যবস্থা দীনা এবং আমি মিলে করবো।

–সিরিয়ালের এন্ডিং নিয়ে ঝামেলা হবে। নাট্যকারের বক্তব্য কী হবে? পরী আছে কি নেই? তারেককে সিরিয়াস দেখায়।

–তোর মন কী বলে? আমি জানি, তুই ফুলকুমারীর অস্তিত্ব স্বীকার করিস। ওর প্রতি তোর দুর্বলতাও আছে। বাইরে ভাব দেখাস তুই খুব যুক্তিবাদী মানুষ।

তারেক দু’দিকে মাথা নাড়ায়। এনামুল এর মানে বুঝতে পারে না।

–এনামুল, আমি একটা ধাঁধার মধ্যে আছি।

–ঠিক আছে, এই ধাঁধাটা নিয়ে সুন্দর নাটক হতে পারে। এটা নিয়েই লেখ।

–আমি কি নিজ থেকে কিছু কাল্পনিক চরিত্র বানাতে পারি?

এনামুল সঙ্গে সঙ্গে বললো, অবশ্যই। একটা প্লটকে এস্টাবলিশ করতে হলে নতুন নতুন ক্যারেক্টার বানাতে হয়, ঘটনা তৈরি করতে হয়, শেষ মুহূর্তে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিতে হয়, আমি তোকে কী বোঝাবো। তুই এগুলো আমার চেয়ে কম বুঝিস না। তুই শুরু কর। আটকে গেলে আমি তো আছি।

তারেক বিড়বিড় করে বললো, কিছু ক্যারেক্টার বানাতে হবে।

–আমার দাদীমার জন্য একটা রোল রাখিস। এনামুল অনুরোধের ভঙ্গিতে বললো।

–এ্যাঁ, তোর দাদীমা টিভিতে এ্যাক্টিং করতে চান নাকি!

হো হো করে কিছুক্ষণ হাসলো এনামুল। তারপর হাসি থামিয়ে, ‘নারে পাগল, দাদী অভিনয় করবে না। গল্পে

ওর চরিত্রটা রাখতে বলছি। অভিনয় করবে কোনো শিল্পী।'

–বুঝতে পারছি না, আমার গল্পে তোর দাদীমার কী রোল থাকতে পারে। তারেকের কপালে ভাঁজ পড়লো।

–আমি বলছি। দাদীকে আমি চিঠিতে ফুলকুমারীর কথা খুলে বলেছি। আশ্চর্য, দাদী ওকে চেনে! ও নাকি দাদীকে ভীষণ মানে।

তারেক দু'পাশে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললো, 'দ্যাখ এনামুল, আমি নাটকে একটা আলোছায়ার পরিবেশ রাখতে চাই, যাকে তুই সুপারন্যাচারাল বলতে পারিস। কিন্তু তা-ও থাকবে হালকা ভাবে। আমি গোঁজামিল, গাঁজাখুরি কোনো ব্যাপার রাখবো না। আধিভৌতিক সিরিয়ালও ভীষণ পপুলার হতে পারে। যেমন বিভিন্ন ইন্ডিয়ান টিভি চ্যানেলে হয়। ওগুলোর মধ্যে রদ্দি মালও আছে। কিন্তু আমারটা তা হবে না।

–আমার দাদীকে প্লটে ঢোকালে সিরিয়াল গাঁজাঘুরি হয়ে যাবে? আরে উনি তো জীবন্ত চরিত্র। শুনবি ঘটনা?

তারেক বললো, 'থাক। তোর দাদীকে একটা রোল দেবো। কিন্তু তুই কিন্তু আমাকে উনার সম্পর্কে ডিটেল বলবি।'

–শোন, আমার দাদী যদি লেখার টেকনিক জানতো, এ রকম একটা প্লটের কথা বলে অনুরোধ করলে নাটক নামিয়ে দিতো। শোন, দাদী চিঠিতে লিখেছেন, ফুলকুমারী তোকে ওদের দেশে নিয়ে যাবেই। পৃথিবীর কোনো শক্তি ওকে আটকাতে পারবে না। এনামুল বললো।

–বুড়ী দেখছি কঠিন চীজ। সারাক্ষণ বুঝি ব্ল্যাক ম্যাজিক আর অকাল্ট নিয়ে থাকে? তারেককে যেন একটু বিরক্ত মনে হয়।

–উনার কী আর করার আছে। বিশাল বাড়িতে একা থাকেন। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। একজন নাতিন ছিলো। বিয়ে হয়ে গেছে। এখন স্বামীর সঙ্গে মাল্টায় থাকে। আর আছি আমি। আমিই শেষ পর্যন্ত থেকে যাবো দাদীর সেবাযত্নের জন্য। উনি মাঝে মাঝে আমাকে ঢাকা থেকে খাঁটি মধু, চন্দন কাঠ, সৈন্দপ লবণ ইত্যাদি নিয়ে যেতে বলেন। আমি নিয়ে যাই।

–তোর দাদী রীতিমতো প্রফেশনাল কবিরাজ। তারেক বললো।

–নারে। দাদী কিন্তু ওষুধের জন্য এক পয়সাও নেন না। আমার বস তাঁর মেয়ের অসুখ ভালো হওয়ার পর দাদীকে একটা দামী শাড়ি গিফট করেছিলেন। দাদী সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

–ও বাবা। তোর দাদীকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে।

–যাবি? তাহলে চল, এই সামনের শুক্রবার যাই। এই তো কাছেই। কালীগঞ্জ। দাদী তোর সব খবর জানে।

তারেক চুপ করে থাকে। তারপর, 'এখন না। নাটকটা শেষ করার পর যাবো। তোর দাদীকে পড়াবো স্ক্রিপ্টটা। কারণ কিছু ভৌতিক ব্যাপার স্ক্রিপ্টে থাকবে। ওগুলো দাদীকে দিয়ে কনফার্ম করিয়ে নিতে হবে।'

–ঠিক আছে। তাই হবে। তুই বসে যা। আমি শিওর, তুই লেখা শুরু করার পর ফুলকুমারীর সঙ্গে তোর যোগাযোগ হয়ে যাবে। ভয় পাবি নাকি?

-ধুর, ধুর! চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি, তার বাইরে কোনো কিছুতে আমি বিশ্বাস করি না। টাকার জন্য আমি টিভির জন্য একটা আধিভৌতিক নাটক লিখছি। ব্যাপারটা কিন্তু এর বেশি কিছু নয়।

- সেটা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, তোর এ নাটকের মেইন ইনস্পিরেশন একজন পরী, যার নাম ফুলকুমারী।

এনামুলের কথার উত্তরে তারেক কিছু বললো না। ও ভাবছে অন্য কথা। নাটক হয়তো হিট হয়ে গেলো, টাকাও

পেলো প্রচুর। কিন্তু নাটকের ভেতর দিয়ে ও মানুষের মধ্যে এক ধরনের অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কার ছড়িয়ে দিচ্ছে। ওর গা রি রি করে ওঠে।

- তারেক?

- বল।

- তুই কোনো মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছিস? এনামুল বললো।

-বার তিনেক শব্দ করে শ্বাস টানলো তারেক। হ্যাঁ। সেই চেনা, মিষ্টি সুরভিটা। ও এমন ভাব করলো, ও কোনো গন্ধ পাচ্ছে না। ওর ভেতরে কোথাও সূক্ষ্ম জ্বলুনি শুরু হয়ে গেছে। এনামুলও গন্ধ পাওয়া শুরু করেছে?

- পাচ্ছিস না? এনামুল ফের জিজ্ঞেস করলো।

তারেক অবলীলায় বললো, 'নাহ্ আমি কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।'

এনামুল চারপাশটা ভালো করে একবার দেখলো। কোনো ফুল গাছ চোখে পড়লো না। অথচ ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, গন্ধের অদৃশ্য উৎসটা ওরা যেখানে বসেছে, সেখান থেকে দূরে নয়। তার অর্থ, ফুলকুমারী ওদের দু'জনের সামনে অথবা পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

॥আট ॥

তারেক নাটক লিখতে বসে গেছে। দ্রুত এগুচ্ছে ঘটনা। এর মধ্যে এক বিকেলে তিন্নিদের বাসায় গিয়ে ও শুনলো, রূপা নেই। রূপা আজ মারা গেছে। তিন্নিদের বাড়িতে কান্নার রোল আর শোকের মাতম। চোখ মুছতে মুছতে তারেক এক ফাঁকে সে বাসা থেকে বেরিয়ে এলো। ও শুনে এসেছে, মৃত্যুর পর রূপার চেহারা নাকি নীল হয়ে গেছে। ফার্মগেট পর্যন্ত নিশিগ্রস্ত মানুষের মতো হেঁটে এসে ও বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালো। একের পর এক বাস চলে যাচ্ছে। এক সময় তারেক ঠিক করলো, ও রূপাদের বাসায় যাবে না। রূপার ক্ষয়ে যাওয়া, নীল মুখ দেখতে চায় না ও। এনামুল এখন বাসায় আছে। ওর ওখানে গিয়ে খবরটা দেয়া দরকার।

রূপার মৃত্যুর খবর শুনে এনামুল অবাক হলো না। ও যেন জানতো, রূপা মারা যাবে। যে ব্যাপারটায় তারেকের খটকা লাগলো, তা হচ্ছে এনামুল রূপার মৃত্যুর সঙ্গে এখন ফুলবানুকে জড়াচ্ছে না। বলছে, কঠিন নিউমোনিয়ায় রূপা মারা গেছে। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে শক। ড্রইংরুমে বসে এনামুলের মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে তারেক। এই সেদিনও ও বলছিলো, ফুলবানু রূপাকে সহ্য করতে পারছে না। তাই ও মেয়েটাকে বাঁচতে দেবে না। গত সপ্তাহে রমনা পার্কে বসে ও তারেককে ফুলবানুকে নিয়ে নাটক লেখার ব্যাপারে কত উৎসাহই না দিয়েছে। আজ সে ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছেই না। এনামুলের হলো কী? ওকে কেমন জানি আলগা-আলগা মনে হচ্ছে, যেটা তারেকের কাছে অচিন্ত্যনীয়।

- এনামুল তোর কি কোনো প্রব্লেম হয়েছে?

তারেক না পেরে বললো।

- হঠাৎ এ প্রশ্ন? আমার কিছু হয়নি। এনামুল জানালায় মুখ রেখে কাটা কাটা ভাবে উত্তর দিলো।

- তোকে আনমাইন্ডফুল দেখাচ্ছে। ভাবীর সঙ্গে কিছু হয়নি তো?

এনামুল মুখ না ফিরিয়েই বললো, 'নাহ্। কিছু হয়নি। আমরা ভালো আছি।'

তারেক কিছু না বলে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'এনামুল, আমার দিকে তাকা। কী হয়েছে তোর? আমার ওপর কোনো ব্যাপারে রাগ করেছিস?

এনামুল তারেকের দিকে ফিরে ম্লান হাসলো, 'নাহ! তোর ওপর রাগ করবো কেন। তুই আমার একমাত্র বন্ধু।

তোর ওপর রাগ করে আমি যাবো কোথায়? চা খাবি?'

- না থাক। ইচ্ছে করছে না।

তারেক বুঝতে পারে, এনামুল তার সঙ্গে আগের মতো মন খুলে কথা বলছে না। বন্ধুত্বের অভিনয় করছে। ওর মনটা তেতো হয়ে গেলো। রূপার মৃত্যুতে এমনিতেও খুব ভেঙে পড়েছে। বন্ধুর কাছে মন উজাড় করে দুঃখের কথাগুলো বলার জন্য এসেছিলো। ও জানে, ওর এই শোকের সময় এনামুল ছাড়া ওর পাশে কেউ দাঁড়াবে না। তার বদলে এ রকম শীতল ব্যবহার?

উঠে যাবে কিনা ভাবছে তারেক। কিন্তু ও যেন উঠে দাঁড়াবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এনামুল কিন্তু আজ নিজ থেকে ওকে একটা প্রশ্নও করেনি। এটাও অদ্ভুত লাগে তারেকের। এনামুল আবার জানালায় মুখ রেখেছে। কিছুক্ষণ উসখুস করে তারেক বেহায়ার মতো বললো, 'এনামুল, নাটকটা প্রায় শেষ করে এনেছি।'

-ও। এনামুল বললো মুখ বাইরে রেখে।

- একটু শুনবি না?

- শোনা। ঠাণ্ডা গলায় এনামুল বললো।

- স্ক্রিপ্ট তো সঙ্গে আনিনি। বুঝতেই পারিস, আজ আমার মনের কী অবস্থা।

- হুঁ। তো, কবে শোনাবি? আমি পরশু বাড়ি যাবো।

- তাই নাকি? আমাকে নিয়ে যাবার কথা ছিলো না? ভুলে গেছিস? তারেক ব্যাকুলভাবে বললো।

-ও, তাই নাকি। আমি বলেছিলাম? ভুলে গেছি।

-সত্যি ভুলে গেছিস? তুই আমার কথা ভুলে গেছিস?

-হ্যাঁ। তোর কথা আমার একদম মনে নেই। সরি। তুই আমার সঙ্গে যাবি?

-নো, থ্যাংকস। তারেক সামান্য চড়া গলায় বললো।

-ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। এসে তোর স্ত্রিপ্ট শুনবো।

গায়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে উঠে দাঁড়ালো তারেক।

-কোথায় যাবি এখন? নিষ্প্রাণ গলায় এনামুল বললো। অন্যদিন হলে অবাক হয়ে ও জিজ্ঞেস করতো, তারেক এখনি কোথায় যাচ্ছে। জোর করে ওকে রেখে দিতো।

তারেক দরজার কাছে এসে বললো, 'জানি না।'

রাস্তায় বেরিয়ে তারেক কিছুক্ষণ এলোমেলো হাঁটলো। একটা বাস যাচ্ছিলো। ওটাতে চড়ে চলে এলো ফার্মগেট। সেখান থেকে অন্য আরেক বাসে গুলশান দুই নম্বর। আজ স্বচ্ছন্দে এলো। পথে ঝক্কিঝামেলা হলো না। তবে তারেক রূপাদের বাসা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলো না। ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বাড়ির সামনে পৌঁছুতে ও দেখলো, উল্টো দিক থেকে এক সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি বা রুমাল পরা একটা ছোট মিছিল আসছে। মাঝখানে একটা খাটিয়া। যে চারজন ওটা কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছিলো, তাদের সামনের দু'জনকে তারেক চিনতে পারলো। দু'জনকেই ও তিন্নিদের ছাদে প্রথম দিনের পার্টিতে দেখেছিলো। যতদূর মনে পড়ে, তিন্নি ওদের মামা বলে ডাকছিলো।

দেখতে দেখতে শব নিয়ে মিছিলটা অনেক সামনে চলে এলো। তারপর বাঁক নিলো ডানদিকের গলিতে। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারেক আন্দাজ করার চেষ্টা করলো, রূপাকে কোন গোরস্থানে কবর দেয়া হবে।

গুলশানে গোরস্থান আছে কিনা ওর জানা নেই। নাভিমূল ছিঁড়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তারেকের বুক থেকে। আশ্চর্য, ওর কোনো রকম কান্না পাচ্ছে না।

পরিশিষ্ট ঃ এ ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেছে। দীনা মাদারটেকের কাছে এক চিলতে ঢালু জমি কিনে ভরাট করার পর চারতলা বাড়ি করেছে। টাকা কিছু নিজের, বাকিটা হাউজ বিল্ডিংয়ের সরকারি লোন। ব্যাংকে ওর একটা বড় অঙ্কের ফিক্সড ডিপোজিট আছে। ওটা রেখেছে ও মেয়ের জন্য। যে বছর গুণ্ডারা এসিড মেরে ওর মুখ এবং গলার এক পাশ পুড়িয়ে বিকৃত করে দেয়, সে বছরের শেষের দিকে ওর সন্তান হয়। ফুটফুটে একটা মেয়ে। এখন বয়স দু'বছর। পরিষ্কার মা ডাকে। দীনা মডেলিং ছেড়ে দিয়ে মাসে মাসে বাড়িভাড়া গোণে। শিশুকন্যাকে নিয়ে চোখ ওর দিন চলে যায়! মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে সারাক্ষণ মুখের এক পাশ ঢেকে রাখে। চোখ দুটো বেঁচে গেছে। জীবনে আর কিছু চাইবার নেই। কন্যাকে নিয়েই এখন ওর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আর স্বপ্ন। এনামুলের অসুখটা ভালো হয়ে গিয়েছিলো। আগের চেহারা ফিরে পেয়েছে, কিন্তু এরপর ওর মাথায় গোলমাল দেখা দিলো। দীনা বলে, ফুলকুমারীর তাবিজে ওর বাচ্চা হয়েছে। এনামুল তা বিশ্বাস করে না। ওর সন্দেহ, বাচ্চাটা তারেকের। তারেকের সঙ্গে নাকি দীনার গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হতো নিয়মিত। মানসিক বৈকল্যের এক পর্যায়ে ফুলকুমারীর কথা এনামুল একদম ভুলে গেলো। এখন ও গনগনে গ্রীষ্মের দুপুরে লুঙ্গির ওপর টাইসহ কালো রঙের কোট এবং মাথায় হ্যাট পরে ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়।

তারেক কয়েক মাসের জন্য ঢাকা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলো। ফিরে এসে নাটকের স্ক্রিপ্টটা নিয়ে দেখা করে এক টিভি প্রডিউসারের সঙ্গে। প্রডিউসার সাহেব বললেন, এটায় আউটডোরের কাজ বেশি, প্রচুর ফ্যান্টাসি আছে। এটা থেকে ভালো ফিল্ম হবে। উনি তারেককে নিয়ে গেলেন ফিল্ম ডিরেক্টর আকমল খানের কাছে। সেই থেকে তারেকের লাইফস্কেচ লেখা হতে থাকে সোনা-রূপার কালিতে। একের পর এক ওর স্ক্রিপ্ট সুপারহিট। এক সময় ও নিজেই নেমে পড়লো পরিচালনায়। প্রডিউসাররা ছুটতে থাকে তারেক চৌধুরীর পেছনে। তারেক চৌধুরীর ছবির বাজেট কোটি টাকা, তার শুটিং হয় নেপাল, সাউথ ইন্ডিয়া, মরিশাস বা রোমে। কোটি টাকার লগ্নি ফিরে আসে কয়েক কোটি টাকা হয়ে। ঢাকাই সিনেমার গোল্ডেন বয় তারেক চৌধুরী।

বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়নি। কিন্তু ও ঠিক করেছে, বিয়ে করবে না। এখনো হঠাৎ-হঠাৎ নাকে পায় মিষ্টি গন্ধটা। কোনো কোনো দিন গভীর রাতে এগারো তলার ব্যালকনিতে নির্ঘুম বসে থাকে। বাসায় ও একা, আর দুটো কাজের ছেলে। চারপাশ ম'ম' করে অলৌকিক সৌরভে। তারেক চৌধুরীর মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে গন্ধটা। ও বিড়বিড় করে, 'রূপা, আমার রূপা।' ইদানিং যখন একা থাকে, তারেক একটা মেয়েলী গলার কান্না শোনে। শব্দটার উৎস ওর আশেপাশেই, ঠিক কোথায় ও ধরতে পারে না। এনামুলের মাথা ঠিক থাকলে বলতো, 'ফুলকুমারী তোর জন্য কাঁদছে।'

For More Books Visit www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com